দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

স্বাধীনতার জন্য বিদেশে থেকে তিন দশক সংগ্রাম চালিয়েছেন রাসবিহারী বসু— পৃঃ ২৩

৭৬ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ২৭ মে, ২০২৪।। ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

নজরুল ও শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্কের কথা আজকের প্রজন্ম জানে না — পৃঃ ২৫

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৭ মে - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

বাম-কংগ্রেসের ভোট বাড়ছে বলে কেন রটাচ্ছে তৃণমূল? লালঝুঁটি কাকাতুয়ার বায়না □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

সন্ন্যাসীদের হুমকি! সাহস বটে দিদির □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

দেশবিরোধী শক্তির নিশানায় ভারত □ প্রশান্ত বাজপেয়ী □ ৮

চীনের সংবিধান হাতে রাহুল গান্ধী : মারাত্মক অভিযোগ হিমন্তের □ বিশ্বামিত্র □ ১০

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবোধের অভাব ঘটিয়েছেছিল

□ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ১১

বর্তমান শাসক দল শিক্ষার অন্তর্জলি সম্পূর্ণ করেছে

□ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল □ ১৩

ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাসবিহারী বসু

□ সায়ন্তন বসু □ ১৫

স্বাধীনতার জন্য বিদেশে থেকে তিন দশক সংগ্রাম চালিয়েছেন রাসবিহারী বসু □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ২৩

ছদ্মবেশ ধারণে অনন্য ছিলেন রাসবিহারী বসু

□ আঁখি মহাদানী মিশ্র □ ২৭

গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের পূর্জিতা দেবী গন্ধেশ্বরী

□ কল্যাণ গৌতম □ ৩১

কাজী নজরুল রচিত শ্যামা সংগীত : রৌদ্রী রূপের প্রকাশ

□ তিলক সেনগুপ্ত □ ৩২

পশ্চিমি মিডিয়ায় হিন্দুফোবিয়া □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ৩৫

সাধুসন্তদের আক্রমণ, অপমান, অসম্মান মুখ্যমন্ত্রীর □ ৪৩

ভারতে ইসলামি আগ্রাসনে পঞ্চমবাহিনী সুফি-দরবেশদের ভূমিকা

□ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ৪৪

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর দীক্ষিত সৈনিক বসন্ত কুমার বিশ্বাস □ তরুণ বিশ্বাস □ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

প্রকাশিত হবে ৩ জুন, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩ জুন, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কদর্য ভোট-রাজনীতির কবলে এরাজ্যের মঠ-মিশন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন— মানব কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ প্রতিষ্ঠানগুলোও রেহাই পেল না এরাজ্যের কদর্য ভোট-রাজনীতির হাত থেকে। এইসব প্রতিষ্ঠান ও সন্ন্যাসীদের নাম ধরে প্রকাশ্য জনসভা থেকে রুচিহীন ভাষায় আক্রমণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দিয়েছেন প্রচ্ছন্ন হুমকিও। আর এতেই উৎসাহিত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মঠ-মিশনে শুরু হয়েছে দুষ্কৃতী আক্রমণ। এ যেন এক নৈরাজ্যের পরিবেশ।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জন্মযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

এক সময় ভারতবর্ষের মাটিতে সোনা ফলিত। তাহার লোভে বৈদেশিক লুঠেরার দল বারবার ভারতবর্ষে হানা দিয়াছে। শুধুমাত্র ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত থাকে নাই, এই দেশের মঠ-মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়াছে। নারীর সম্ভ্রম হরণ করিয়াছে, অবশেষে এই দেশের শাসক হইয়া বসিয়াছে। দেশকে পরাধীন করিয়াছে। স্বাভিমানী ভারত-সন্তানরা কিন্তু কোনোদিন বৈদেশিক শাসন, শোষণ ও অত্যাচার মানিয়া লন নাই। বুকের রক্ত ঢালিয়া তাহারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সতত সংগ্রাম করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু হাজার বৎসরের পরাধীনতার ইতিহাস নহে, তাহা সতত সংগ্রামেরও ইতিহাস। আধুনিক ইতিহাস সেই সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপ্লবী অভিধায় ভূষিত করিয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তাঁহারা সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দেশে-বিদেশে তাহারা বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই নমস্য। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তাহাদের আত্মত্যাগ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হয়। কিন্তু বিপ্লবের মহাযজ্ঞে যিনি অগ্রগণ্য, যিনি রূপকথার নায়ক-সদৃশ, যিনি জীবনের অর্ধাংশকাল বিদেশে থাকিয়া শেষনিশ্বাস পর্যন্ত ভারতের শৃঙ্খলমোচনের ঋত্বিকরূপে বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছেন, দেশবাসী তাঁহাকে বিশেষ মনে রাখে নাই। স্বাধীনতার এতগুলি বৎসর পরেও তাঁহার জন্মভিটা সংরক্ষণের কোনোরূপ উদ্যোগ লওয়া হয় নাই। তাঁহার নিজের কথাতেই তিনি জন্মযোদ্ধা। তিনি রাসবিহারী বসু। বাঙ্গালি তাঁহার নাম খুব একটা জানে না। সেই কারণেই তাঁহার জন্ম অথবা প্রয়াণ দিবস ঘটা করিয়া পালন করা হয় না। কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকার কেউ অদ্যাবধি তাঁহাকে কোনো সম্মানে ভূষিত করে নাই। কিন্তু বহু পূর্বেই জাপান সরকার তাঁহাকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'সেকেন্ড অর্ডার অব দ্য মেরিট অব দ্য রাইজিং সান'-এ ভূষিত করিয়াছে। তাঁহার শিষ্যতুল্য সতীর্থরা মনে করিতেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার কর্মকৌশল, আত্মত্যাগ ইত্যাদিতে প্রভাবিত হইয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'পথের দাবী' উপন্যাসে রাসবিহারী বসুকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করিয়াছেন। আর সেইজন্যই ব্রিটিশ সরকার উপন্যাসটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল।

জীবনের চল্লিশটি বৎসর তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির ঘুম কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৯১২ সালে খোদ বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত নাড়িয়া দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশের চক্ষে ধুলা দিয়া তিনি বিদেশে যাইয়া সৈন্যদল গঠন করিয়াছেন। তাঁহারই কর্মদক্ষতায় জাপানি কর্তৃপক্ষ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার দেশপ্রেমে অভিভূত হইয়া সাধারণ একজন জাপানবাসী তাহার নাবালক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। তাহার ফলে জাপান সরকার তাঁহাকে জাপানি নাগরিকত্ব প্রদান করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ স্থাপনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মালয় ও বর্মা ফ্রন্টে জাপানের হাতে যুদ্ধবন্দি ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনানীদের লইয়া তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ভারত হইতে চিরতারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসুকে আহ্বান করিয়া তাহাকে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া তিনি স্বয়ং উপদেষ্টা পদে রহিয়াছেন। তিনি জীবদ্দশায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির একটি বাহিনী ব্রিটিশের কবল হইতে আন্দামান ও নিকোবর উদ্ধার করিয়াছে এবং আর-একটি বাহিনী ভারতে মণিপুরের মৈরাং সীমান্তে উপনীত হইয়াছে। যাহারা বলেন, ভারতের স্বাধীনতা শুধু আবেদন নিবেদনের ফলেই আসিয়াছে তাহারা যে সত্যের অপলাপ করেন তাহা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির স্বীকারোক্তিতেই প্রমাণিত হইয়াছে। অ্যাটলি বলিয়াছিলেন, তাহাদিগের ভারত ত্যাগের পশ্চাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা সর্বাধিক। অর্থাৎ নেপথ্য নায়ক রাসবিহারী বসুর। স্বস্তিকার বর্তমান সংখ্যাটি সেই জন্মযোদ্ধা রাসবিহারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ। তাঁহার কর্মকাণ্ড অনুধাবন করিয়া বর্তমান প্রজন্ম দেশগঠনে অধিকতর অনুপ্রাণিত হউক, ইহা আশা।

সুভাষিতম্

ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাপমানে চ কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃপরুষং ব্রূয়াৎ স বৈ সাধূত্তমঃ স্মৃতঃ।। (মনুস্মৃতি)

যিনি সম্মানে আনন্দে আটখানা হয়ে যান না এবং অপমানে ক্রোধিত হন না এবং ক্রোধিত হয়ে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন না, তাঁকেই শ্রেষ্ঠ সাধু বলা হয়।

বাম-কংগ্রেসের ভোট বাড়ছে বলে কেন রটাচ্ছে তৃণমূল ?

লালঝুঁটি কাকাতুয়ার বায়না

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রাজ্যজুড়ে এক উদ্ভট আওয়াজ উঠছে। বিদেশি বাম আর ক্ষয়ে যাওয়া কংগ্রেসের ভোট বাড়বে। সাপ আর নেউল হয়েই জন্মেছিল দুই দল। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আর তৃণমূলের সুনামিতে ভেসে গিয়েছে। জোট বেঁধে বাঁচার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে কেরালায় সাপ নেউলের লড়াই চলছে। ২০১৯-এর ভোটে পশ্চিমবঙ্গে তারা ১১ শতাংশ ভোট পায়। ২০২১-এর রাজ্য ভোটে ভরাডুবি হয়। তৃণমূল ৫৪টি আসন কেড়ে নেয়। ২০২৪-এর লোকসভা তা বেড়ে ১৫-২০ শতাংশ হবে বলেই প্রচার চলছে। বিশেষকদের মতে বাম-কংগ্রেসের ভোট বাড়লে দুর্নীতির জয়। কারণ তাতে মমতার ফয়দা। সংখ্যালঘু ভোটের খানিকটা তৃণমূল থেকে সরে গেলেও বামেদের যে ভোট একসময় বিজেপিতে চলে গিয়েছিল তা যদি ফেরে তাতে মমতার লাভ। মুসলমান ভোটের উপর মমতা পুরোপুরি নির্ভরশীল।

বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি বাম-কংগ্রেস ভোট কাটুয়া। এ রাজ্যে তারা শূন্য হলে মমতার বিদায় নিশ্চিত। মৌখিকভাবে ধ্বংস চাইলেও মমতা তাদের এজেন্ট হিসেবেই ব্যবহার করেন। তাই সিপিএম-কে রাজ্য থেকে পাততাড়ি গোটাতে হয় এমন ব্যবস্থা মমতা কখনো নেননি। মমতার আন্দোলনকালে সিপিএমও মমতার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। তাকে জেল বা পুলিশ হেফাজতে ঢোকায়নি। বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মমতা তাই বামকে অস্ত্র করতে চান। তৃণমূলের নেতার কথায় 'বিজেপির সঙ্গে একক লড়াইয়ের শক্তি আমাদের নেই। বামেরা আমাদের ঢাল।' ৪২-এর মধ্যে ১৯ আসনে বাম-কংগ্রেস 'ব্যালান্সিং ফ্যাক্টর'। তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক হয়ে গিয়েছে। সেখানে মমতাও রয়েছেন।

সুপ্রিম আদালত পরোক্ষে মমতার সরকারকে জালিয়াত আর মিথ্যাবাদী বলেছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে বিজেপি প্রধান শক্তি। বাম-কংগ্রেসের সেই কোমরের জোর নেই। তাই বাম-কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার মানে ভোট নষ্ট করা। রাজ্যে বা কেন্দ্রে কোথাও তারা দাগ কাটতে পারবে না। তাই প্রশ্ন উঠছে খসে যাওয়া ওই দুই দল হঠাৎ কী করে মাথাচাড়া দিচ্ছে? ১৮ আসনে ভোট হয়েছে। বাকি ২৪ আসনের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে এই বাম-কংগ্রেসের ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর। তাই তৃণমূল জেগে উঠেছে। বাম-কংগ্রেস নিজের ভোট ঘরে তুললে লাভ তৃণমূলের। ওই ভোট যাতে কোনোভাবে বিজেপিতে না যায় সেটাই মমতার লক্ষ্য।

দক্ষিণবঙ্গ মমতার গড়। সেই গড়ে বিজেপি ঢুকলে মমতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই লোক নামিয়ে মমতা তার প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলতে সিপিএম আর কংগ্রেসের ভোট বাড়ছে বলে প্রচার শুরু করেছে। উদ্দেশ্য সিপিএম আর কংগ্রেসের হয়ে মানুষের মনে নতুন করে আস্থা তৈরি করে দেওয়া যাতে তারা তাদের ভোট বিজেপিতে বদলি না করে। মমতা কিন্তু মুখোশ সেঁটে সিপিএম আর কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছেন। দু' দলকে নীচু করতে বলছেন, 'ও দুটোর সঙ্গে রাজ্যে কোনো সম্পর্ক নেই'। অথচ তাঁর সমর্থক আর কর্মীরা সিপিএমের ভোট বাড়ছে বলে সাইলেন্ট বা নিঃশব্দ প্রচার করে চলেছেন।

মমতার কাছে বাম-কংগ্রেস যতটা গুরুত্বহীন বিজেপি ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ আর শক্তিশালী। মমতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি কতটা সফল হচ্ছেন তার ওপর।

অধীর চৌধুরী বা অমরিন্দর সিংহরা কংগ্রেসের কেউ নয় বলে আগেই লিখেছিলাম। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আমার কথা প্রমাণ করেছেন। এটা বোঝা খুব কঠিন নয় যে মমতা এ রাজ্যে বাম ও কংগ্রেসকে কোনো গুরুত্ব দেন না। মমতার শ্লাঘা ১৯৯৮ সালে তিনি রাজ্য কংগ্রেসকে ভেঙেছিলেন আর ২০১১-তে বামপন্থীদের তাড়িয়েছিলেন। মমতার কাছে বাম-কংগ্রেস যতটা গুরুত্বহীন বিজেপি ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ আর শক্তিশালী। মমতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি কতটা সফল হচ্ছেন তার ওপর। তাই বিজেপিকে আটকাতে তিনি যে ছলচাতুরি আর মিথ্যা ছলাকলার আশ্রয় নেবেন এটাই স্বাভাবিক। আর ঠিক সেই জন্য রাজ্যের লালঝুঁটি কাকাতুয়াদের ভোট বাড়ানোর বায়নাটা তিনি করছেন। তবে মমতার এই নতুন ঠুলি এ রাজ্যের মানুষ পরবে বলে মনে হয় না। কাকাতুয়া আর ময়না (কংগ্রেস)-দের শূন্য পানে চেয়েই প্রহর গুণে গুণে সময় কেটে যাবে। বিদেশি বামপন্থী আর কংগ্রেস কোনোদিন এ রাজ্যের দল হয়ে উঠতে পারবে না। যুদ্ধে যাওয়া ঘোড়ার মতো তারা আর ফিরবে না। ■

সন্ন্যাসীদের হুমকি! সাহস বটে দিদির

দুধেল গাই প্রিয়েষু দিদি,

ভারতের সনাতন সন্ত সমাজ এমন আক্রমণ আগে দেখেনি। বিদেশি শক্তির আক্রমণের মুখে পড়লে তার জবাবও দিয়েছেন সন্ন্যাসী সমাজ। কিন্তু ঘরের মধ্যে এমন বিষধরের আক্রমণ! আমি জানি দিদি, লোকসভা নির্বাচনে ভোটব্যাংক রক্ষার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই আপনি বাঙ্গালির তথা দেশের তথা বিশ্বের প্রাণের তিন সংগঠনকে আক্রমণ করেছেন। কলুষ-ভাষণে তিন প্রতিষ্ঠানকে, সন্ন্যাসীদের এবং অগণিত ভক্তের আবেগকে আহত করেছেন।

কিন্তু আমি ভাবছি, এত সাহস কে দিয়েছে আপনাকে? মুসলমান ভোটব্যাংক? কত শতাংশ তাঁরা? বড়ো জোর ৩০ শতাংশ! কিন্তু আপনি জানেন, বাকি ৭০ শতাংশ হিন্দু এক হতে পারবে না। সেটা ভেবেই এই আক্রমণ আমি জানি। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমী হিন্দুর ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন আপনি। যাঁদের বিরুদ্ধে আপনার এই আক্রমণ তাঁদের কতটা চেনেন? সমাজে তাঁদের অবদান কতটা বোঝেন? হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আপনি বিভিন্ন সময়ে নিজের অভিষ্ট পূরণের জন্য ব্যবহার করেছেন। আপনার যাবতীয় প্রেম, শ্রদ্ধা যে আসলে ভোটলোভী অভিনয় তা সবাই জানে। সন্তরাও জানেন। কিন্তু উদারতা দেখিয়ে কখনও তাঁরা আপনাকে অসম্মান করেননি। কিন্তু এবার দিদি, ভক্ত সমাজ জাগরিত।

প্রথম কয়েক দফার ভোট আপনার এলাকায় ছিল না। আপনি সে সব জায়গায় কিছু করতে পারবেন না বুঝে সাধারণ আক্রমণ চালিয়েছেন। বিরক্ত হয়ে অশ্লীল শব্দও প্রয়োগ করেছেন। আর যখন দেখলেন আপনি নিজের গড় হিসাবে ভাবেন এমন জায়গাতেও সমর্থনের জোয়ার নেই তখন হিন্দু সন্ত সমাজকে গাল দিতে শুরু করে দিলেন! জানি, এর পরেও আপনার দাসানুদাস, অনুদানলোভী এক দল স্বার্থসর্বস্ব, মেরুদণ্ডহীন, আত্মমর্যাদা খোয়ানো হিন্দুর সমর্থন আপনি পাবেন। তাতে হয় তো অনেক জায়গায় জয়ও আসবে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, উদারতার সুযোগ নিয়ে সন্ন্যাসীদের হুমকি দেওয়া যায় কি? ঋষিমুনিদের এই ভারতে?

আমি বলে রাখছি দিদি, সবাই এখন প্রমাদ গুনছেন যে, সন্ন্যাসীদের আক্রমণের যে উদাহরণ তৈরি করেছেন আপনি তাকে প্রশ্রয় দিলে হিন্দু সমাজের জন্য আগামীদিন অত্যন্ত ভয়ংকর। তাঁরা ঘুরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে আপনি কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারবেন না। আপনার জয়ের মুকুট কাঁটার হয়ে যাবে।

দিদি, ভোট আসবে, যাবে কিন্তু চিরকাল একই থেকে যাবে ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষক সাধুসন্ত সমাজ। সেবা ও শান্তি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য, গরিমার ধারকরা নাগরিকদের সুপথে চালিত করার জন্য সাধুসন্তরা তাঁদের সাধনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের কাজও করেন। আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন কারও বিপদ দেখলে। আর্তের সেবায় নিয়োজিত তাঁদের প্রাণ। আজ হিন্দু সমাজই আপনার শাসনে এই রাজ্যে আর্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অনেক বিধর্মীর সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। তার পরেও তিনি বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন। গঠন করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন। যে প্রতিষ্ঠান সেবা আর শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। আধ্যাত্মিক প্রেরণার পাশাপাশি সামাজিক কাজকেও অগ্রাধিকার দেয়।

> **বঙ্গভূমিতে জন্ম নেওয়া তিন সর্বজনপূজ্য ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান যখন গোটা বিশ্বে সুনামের শিখরে তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে অসম্মান করতে সাহস পায় কী করে?**

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ এই বঙ্গভূমিতেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। আজ গোটা বিশ্বে সঙ্ঘের কাজ ছড়িয়ে। ভারতের যে কোনও প্রান্তে তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুদের আশ্রয়ের নাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। যেখানেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা দুর্ঘটনা সবার আগে সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা সেবা সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যান। কুম্ভ থেকে গঙ্গাসাগর মেলা সর্বত্র পুণ্যার্থীদের সেবায় নিয়জিত থাকেন সন্ন্যাসীরা।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ ইসকন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতীয় ভক্তি ভাবধারার স্রোত আজ গোটা বিশ্বে বহমান। এই সংস্থা পাশ্চাত্যেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রচারের কাজে সদা নিয়ত। হিন্দু ধর্মের ভাগবত পুরাণকে বিশ্বের কাছে নতুন মর্যাদা দিয়েছে ইসকনের আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে আজ বিশাল মন্দির গোটা বিশ্বের কৃষ্ণ ভক্তদের কাছে পুণ্যতীর্থ।

বঙ্গভূমিতে জন্ম নেওয়া তিন সর্বজনপূজ্য ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান যখন গোটা বিশ্বে সুনামের শিখরে তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে অসম্মান করতে সাহস পায় কী করে?

কারণ, খুবই স্পষ্ট। এরাজ্যে হিন্দু সমাজ এখনও পর্যন্ত জানে না তাঁর পূর্ব-পরিচয়। দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসনে থাকা বাঙ্গালি ভুলে গিয়েছে যে হিন্দুরা ঋষিমুনির বংশধর। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসুরী। স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দুদের এক হতে বলেছিলেন। তাঁর কথা ছিল, 'আজ সময় এসেছে হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার।'

আপনি যাই বলুন দিদি, আজ সত্যিই বাঙ্গালির উচিত হিন্দু হয়ে ভোট দিতে যাওয়া। কারণ, আপনি হিন্দু-বিরোধিতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। □

অতিথি কলম

দেশবিরোধী শক্তির নিশানায় ভারত

প্রশান্ত বাজপেয়ী

দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলতে যারা গর্ত খোঁড়েন, সেই গর্তে তারা নিজেরাই একদিন পড়েন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিপদে ফেলতে গিয়ে রাহুল গান্ধী নিজের অজান্তেই দেশকে বিপদে ফেলার জন্য গর্ত তৈরি করে ফেলেছেন। শেষমেশ কংগ্রেস সমেত সেই গর্তে তিনি নিজেই পড়ে গিয়েছেন। এই ঘটনাক্রমের পুনরাবৃত্তি চলছে তো চলছেই। দেশে সাধারণ নির্বাচন চলাকালীনও এই ঘটনা বার বার প্রকাশ্যে আসছে। কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে জানিয়েছে যে দেশের ক্ষমতা হাতে পেলে তারা দেশবাসীর সম্পত্তির বিষয়ে বিশদ সমীক্ষা করাবে। তাদের ইস্তেহারে প্রকাশিত এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে স্যাম পিত্রোদা এই দাবির পক্ষে বলেন যে আমেরিকাতে ছেলে- মেয়েরা বাবার সম্পত্তির ৪৫ শতাংশ পাওয়ার অধিকারী। উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের প্রাপ্য সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়।

নকশালি চিন্তাভাবনার আখড়া : রাষ্ট্রীয় গৌরব পুনরুদ্ধার, ২০৪৭ সালে এক বিকশিত, সুরক্ষিত ভারত, বিশ্বমানের জাতীয় সড়ক, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার মতো প্রকল্পের বিকল্প রাহুল গান্ধীর কাছে নেই। তার পরিবর্তে লোকজনের সম্পত্তি হরণ করে বিতরণের স্বপ্ন ফেরি করতে ব্যস্ত কংগ্রেস। এখন প্রশ্ন হলো যে কার থেকে সম্পত্তি কেড়ে কাকে বা কাদের দেওয়া হবে? বাস্তবে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মাও-স্তালিন-পলপট মার্কা বিকৃত বামপন্থী চিন্তাধারার ফেরিওয়ালা হয়ে ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করার রাস্তা নিয়েছেন। এই বিকৃত মত অনুযায়ী, সামাজিক স্তরে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত লোকজন সমাজের প্রান্তিক মানুষের শত্রু, কংগ্রেস-বামেরা ক্ষমতায় এলে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকজনের সম্পত্তি গরিবদের হাতে যাবে। এর অর্থ হলো, দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী গরিবরা নিম্ন মধ্যবিত্তদের বাড়িঘর-দোকানের দখল নেবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে টার্গেট বানাবে। মধ্যবিত্তরা উচ্চ মধ্যবিত্তদের এবং উচ্চ মধ্যবিত্তরা উচ্চবিত্ত বা প্রভূত বিত্তশালীদের ধন-সম্পত্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি সমূহকে দেখে যেন ঈর্ষায় জ্বলে। সংক্ষেপে এই হলো রাহুল গান্ধী কথিত— 'মহব্বত কী দুকান'! এইভাবে দেশ জুড়ে চরম অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে তৎপর হয়ে কমিউনিস্ট আদবকায়দা, রীতিনীতি হুবহু নকল করে চলা রাহুল গান্ধী ইদানীং অতিবাম বা নকশালি কথাবার্তা আউড়ে চলেছেন। কংগ্রেসি ইস্তেহারের গালভরা নাম— ন্যায় পত্র। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে চললেও রাহুল গান্ধীর ভাষ্যে ন্যায় বা সংবিধানের লেশ মাত্র নেই। প্রকৃতপক্ষে রাহুল গান্ধী সমাজবাদী রাজনীতির কুখ্যাত উত্তরাধিকারীর ভাবসাব দেখিয়ে কর বৃদ্ধি এবং লাইসেন্স-কেন্দ্রিক মাফিয়ারাজ ব্যবস্থার শাহজাদা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি পরখ করে দেখেছেন যে তোষণের ছুরি কোমরে বেঁধে, সাধারণ মানুষকে 'গরিবি হটাও'-এর আফিম খাইয়ে দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রে পরিবারতন্ত্র টিকিয়ে রাখা সহজ।

ভোটব্যাংকের পঙ্কিল রাজনীতি : রাজনৈতিক পরিসরে পরিবারতন্ত্র কায়েম করে পরিবারের হাতে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এই প্রক্রিয়ায় শামিল হয়ে নিজেদের তৈরি এই জালে নিজেরাই এবার জড়িয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। একটি নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন— ভোটব্যাংকের অতীব নোংরা রাজনীতিতে এতটাই নিমজ্জিত রয়েছে কংগ্রেস যে বাবাসাহেব আম্বেদকর রচিত সংবিধানের পরোয়া করে না তারা। কংগ্রেস তাদের ইস্তেহারে লিখেছে যে দেশের জনগণের সম্পত্তির সার্ভে তারা করাবে। তাদের নেতা বলে বেড়াচ্ছেন যে দেশের জনতার সম্পত্তির এক্স-রে করা হবে। অন্য একটি সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন— 'এর আগে তাদের সরকারে থাকাকালীন তারা বলেছিল যে দেশের যাবতীয় সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার রয়েছে মুসলমানদের। তার মানে এই সার্ভের মাধ্যমে মানুষের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ছক কষে সেই সম্পত্তি একত্র করে কাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে? যাদের ছেলেপুলের সংখ্যা বেশি তাদের মধ্যে এই সম্পত্তির বাঁটোয়ারা হবে? অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে ভাগ করা হবে এই সম্পত্তি? দেশবাসীর পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত অর্থ দেওয়া হবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের? কংগ্রেস প্রকাশিত ইস্তেহার বলছে যে দেশের মানুষের সম্পত্তি বিতরণ করা হবে। তো কাদের দেওয়া হবে এই সব অধিগৃহীত, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি? তাদের দেওয়া হবে যাদের ব্যাপারে মনমোহন সিংহের সরকার দেশের যাবতীয় সম্পদে প্রথম অধিকার বলে ঘোষণা করেছিল?'

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসা এই সত্যগুলিকে কি কংগ্রেস অস্বীকার করতে পারবে? কীভাবে তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করবে? গত সত্তর বছর ধরে তোষণ ও ভোটব্যাংকের রাজনীতিতে পুরোপুরি লিপ্ত কংগ্রেস হিন্দুদের কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছিল। এখনও কি কংগ্রেসের এহেন চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত

হচ্ছে? বৈষম্য ও পক্ষপাতমূলক এবং তোষণের রাজনীতি-জাত ওয়াকফ আইন বানিয়ে কংগ্রেস দেশের বহু জমিজমা, সম্পদ ওয়াকফ বোর্ডের নামে নিবন্ধীকৃত করে ফেলেছে। কংগ্রেস আমলে পাশ হওয়া এই আইনের কারণে মুসলমানদের ওয়াকফ বোর্ড এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তাদের দৌরাত্ম্যে নিজেদের জমি বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয় মাদ্রাজ হাইকোর্ট। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষদের হাল যে কী শোচনীয় তা সহজেই অনুমেয়!

মনে রাখতে হবে যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের লোগো বা প্রতীক চিহ্ন থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক কমল বা পদ্মফুল সরিয়ে চাঁদ-তারা ও ক্রসের আমদানি করা হয়। মোদীজী পুনর্নির্বাচিত হলে দেশজুড়ে সনাতনী সংস্কৃতির উত্থানজনিত আশঙ্কা ও ভয় বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের গলায় স্পষ্ট। ইউটিউবে ঘুরে বেড়ানো ভিডিয়োতে তার দেওয়া বয়ানেই তার এই আশঙ্কার প্রতিফলন রয়েছে। তার ছেলে প্রিয়ঙ্ক খাড়গে এবং কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ডিএমকে নেতা উদয়ানিধি স্ট্যালিন হিন্দুধর্মকে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করা ছাড়াও সবরকম প্রক্রিয়ায় হেয় করেছেন, অপমান ও অসম্মান করেছেন। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী সমাজবাদী পার্টির নেতা রামগোপাল যাদব বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনারত হিন্দুদের 'পাখণ্ডী' (পাষণ্ড / ভণ্ড) আখ্যা দেন। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলি তাদের পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির তরফে মুসলমানদের সংরক্ষণের যাবতীয় সুবিধা দিয়ে রেখেছে। সম্প্রতি কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার রমজান মাসে মুসলমান সরকারি কর্মচারীদের ছুটির নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়। হিন্দুদের উৎসব, পূজাপার্বণে কি হিন্দু কর্মচারীরা অনুরূপ অনুগ্রহ প্রত্যাশা করতে পারেন? জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সরকারি ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো ছাড় কি আদৌ দেওয়া যায়?

কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বাধীন ইন্ডি জোটের সহযোগী দলগুলির তরফে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিশেষ অনুগ্রহ এবং সব রকমের সহায়তা দানের প্রসঙ্গটিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যে উঠে এসেছে। মোদীজীর বক্তব্যকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে দাগিয়ে দিয়ে নিজেদের এই ক্রিয়াকলাপের দায়ভার কংগ্রেস নিজেদের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেও সত্যিগুলো আর কোনো ভাবেই চাপা থাকছে না। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদের ভোটব্যাংক বানিয়ে, সেই ভোটব্যাংক রক্ষায় অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি অনবরত তোষণের নীতি গ্রহণ করে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলি। সেই ভোটব্যাংক বাঁচাতে আজও তারা সমান তৎপর। কংগ্রেস ও তার জোটসঙ্গী দলগুলি কোনোদিনই অনুপ্রবেশ বন্ধে কোনো পদক্ষেপ তো গ্রহণ করেইনি, বরং অনুপ্রবেশে ক্রমাগত মদত দিয়েছে। কংগ্রেস ও এই দলগুলি অনুপ্রবেশকারীদের রেশন কার্ড ও ভোটার আইডি কার্ডও বানিয়ে দেয়। অনুপ্রবেশ বন্ধে কংগ্রেস সরকার ১৯৮৩ সালে আইএমডিটি অ্যাক্ট আনলেও অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে বহিষ্কারের লক্ষ্যে এই আইন তারা পাশ করায়নি। ভারত থেকে তাড়ানোর পরিবর্তে এই আইন অনুযায়ী এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে পাকাপাকিভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই আইনের মাধ্যমে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড়ে না চাপিয়ে সেই দায় অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে তথ্য ও খবরাখবর সরবরাহকারীদের ওপর চাপানো হয়। অর্থাৎ এই আইন অনুসারে— কারুর বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের অভিযোগ কেউ তুললে সেই অভিযোগকারীকেই প্রমাণ করতে হবে যে তার দ্বারা অভিযুক্তরা ভারতীয় নাগরিক নয়। নিজপক্ষ সমর্থনে অনুপ্রবেশকারীদের থেকে কোনো ভারতীয় পরিচয়পত্র বা তথ্য প্রমাণ চাওয়ার সংস্থান পর্যন্ত এই আইনে ছিল না। তদন্তের স্বার্থে তদন্তকারী আধিকারিকদের অভিযুক্ত অনুপ্রবেশকারীদের আবাস স্থলে যাওয়া বা তল্লাশি করার অধিকার বা অনুমতিও দেওয়া হয়নি এই আইনে। এমনকী প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য অভিযুক্ত অনুপ্রবেশকারীদের ওপর কোনো চাপও দিতে পারতেন না তাঁরা। তদন্তকারী সংস্থাকে অনুপ্রবেশকারীদের সন্ধান দিয়ে এবং সেই লক্ষ্যে অভিযোগ দায়ের করে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করা ভারতীয় নাগরিকদেরও কোনো সাহায্য এই আইন করেনি। উলটে অভিযোগপত্র দায়েরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা তাদের জমা করতে হতো। এত কিছুর পরে অভিযোগকারী তার আনা অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে তার বিরুদ্ধেই মামলা দায়েরের নির্দেশ ছিল এই আইনে! ২০০৫ সালে এই আইনটিকে বাতিল ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট। আইনটি রদ করার সময়ে বেআইনি অনুপ্রবেশে লাগাম পড়ানোর বিষয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে তার প্রশাসনিক কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। চাণক্যের বাণী উদ্ধৃত করে তাদের দেওয়া রায়ে কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট বলে যে বহিরাগত বা বৈদেশিক আক্রমণ এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপ ও গতিবিধির আঁচ থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখাই দেশের সরকার বা প্রশাসনের মূল দায়িত্ব।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোক সংবাদ

মালদা জেলার গাজোল খণ্ডের শিবাজীনগর শাখার স্বয়ংসেবক শ্রীকৃষ্ণ ঘোষের পিতৃদেব ভবেশচন্দ্র ঘোষ গত ১৮ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি শিবাজীনগরে সঙ্ঘকাজ বিস্তারে অনেক সাহায্য করেছেন।

চীনের সংবিধান হাতে রাহুল গান্ধী মারাত্মক অভিযোগ হিমন্তের

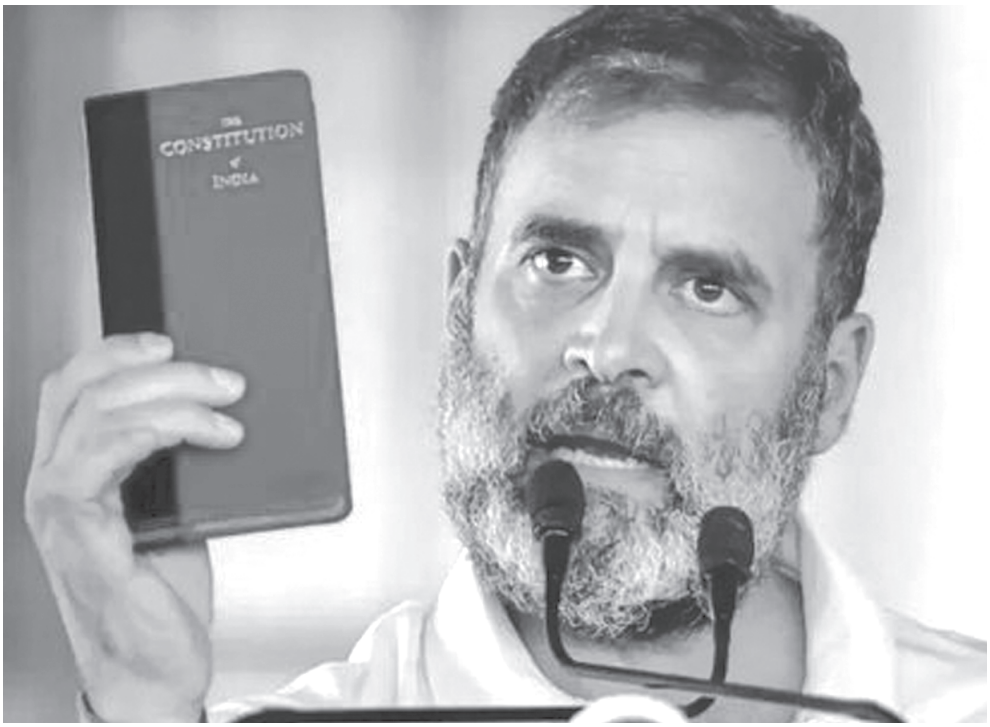

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা পঞ্চম দফা নির্বাচনের মুখে অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তে ভোট প্রচারে একটি সমাবেশে চীনা সংবিধান প্রদর্শন করছেন। বিশ্বশর্মার দাবি, রাহুল গান্ধীর দেখানো বইটি মূল চীনা সংবিধানের মতো লাল প্রচ্ছদযুক্ত, যেখানে মূল ভারতীয় সংবিধানে নীল প্রচ্ছদ রয়েছে। বিশ্বশর্মা তাঁর এক্স-হ্যান্ডেলে (পূর্বতন টুইটার) লেখেন, 'রাহুল হাই-মিটিঙে আসা লোকদের কাছে একটি লাল চীনা সংবিধান প্রদর্শন করছেন'। বিশ্বশর্মার আরও বক্তব্য যে, ভারতীয় সংবিধান নীল রঙের মলাটে আবৃত। এটি রাজ্যের নীতির নির্দেশমূলক নীতিমালা নামে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করে, যা আমাদের দেশে অভিন্ন সিভিল কোড প্রণয়ন করাকে একটি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে; রাহুল এখন এর বিরোধিতা করছেন।

সেই সূত্রে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত, 'তাই আমি নিশ্চিত যে তাঁর হাতে থাকা সংবিধান অবশ্যই চাইনিজ হবে'। অসমের মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রাহুল গান্ধীর একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তাঁর হাতে একটি লাল মলাটের রয়েছে। তিনি এমন ছবিও শেয়ার করেছেন, যাতে রাহুল গান্ধীকে কিছু চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে দেখা যাচ্ছে। বেজিং অলিম্পিক চলাকালীন রাহুলের সফরের সময় স্বাক্ষরিত চুক্তিটি-সহ ছবিতে সোনিয়া গান্ধীকে তাঁর ছেলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। লাল রঙের বাঁধানো মলাটের বইয়ের সঙ্গে কংগ্রেস নেতার ছবি শেয়ার করে বিশ্বশর্মা লিখেছেন, 'ভারতের সংবিধানের আসল কপিতে নীল প্রচ্ছদ রয়েছে। মূল চীনা সংবিধানে লাল প্রচ্ছদ রয়েছে। রাহুল চীনা সংবিধান বহন করেন কিনা তা আমাদের যাচাই করতে হবে।' প্রসঙ্গত, ভারতীয় রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে রাহুল গান্ধীর চীনের প্রতি প্রেম নতুন কিছু নয়।

প্রমাণ হিসেবে, একইসঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রী একটি কাঁচের বাক্সে প্রদর্শিত মূল ভারতীয় সংবিধানের ছবিও পোস্ট করেছেন, যার নীল প্রচ্ছদ রয়েছে। বেশ কিছু এক্স হ্যান্ডেল ব্যবহারকারী ও কিছু সংবাদ-সংস্থা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের একাধিক ছবি পোস্ট করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, ভারতীয় সংবিধানের অনুরূপ ছোটো পকেট সংস্করণ লাল রঙের প্রচ্ছদে মোড়া থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, লাল রঙের মলাটে বাঁধানো ভারতীয় সংবিধান আদতে একটি পকেট সংস্করণ যা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়েছে।

তাই দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে রাহুল গান্ধীর হাতে সত্যিই চীনের সংবিধান ছিল কিনা, নির্বাচন কমিশনের তা তদন্ত করে দেখা উচিত। □

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবোধের অভাব ঘটিয়েছিল

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

সংসদীয় রাজনীতির বর্তমান চেহারা যে বিবর্ণ ও সুবিধাবাদী সামাজিক চরিত্রের জলছবি— এ বিষয়ে বহু সংবেদনশীল মানুষকে সহমত পোষণ করতে দেখা গেছে। স্বাধীনতার ৭৬ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও এমন ছবি ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে যে মোটেই সুখকর নয়, সেকথা সহজেই বলা যায়। যেমন রাজনীতির সুবিধাবাদী চেহারা প্রকট হয়েছে, তেমনি ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী রূপ হলো জাতীয়তাবোধের অভাব। পৃথিবীর সব দেশেই রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিকের অবশ্য পালনীয়— এমনকী কমিউনিস্ট দেশগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। শুধুমাত্র ভারতেই অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের ঘোষিত নীতি সরাসরি জাতীয়তাবোধ বিরোধী। এখানে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' স্লোগান দেওয়া মানুষরাও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকেন। একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল— সিপিআইএম তার সাম্প্রতিক নির্বাচনী ইস্তাহারে জানিয়েছে যে, তারা নির্বাচনে জয়লাভ করলে কাশ্মীরে আবার ৩৭০ ধারা লাগু করবে। তারা দেশের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাউকে দেশে চাকরি করতে দেবে না।

তাছাড়া, তারা সিএএ বাতিল করে পার্শ্ববর্তী ইসলামি দেশগুলি থেকে ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে শরণার্থী হয়ে আসা অমুসলমান মানুষদের নাগরিকত্ব দিতে বাধা দেবে এবং সেইসঙ্গে মানবিকতার দোহাই দিয়ে মায়নামারের রোহিঙ্গাদের, যারা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত, তাদের নাগরিকত্ব দেবে। এদের সহযোগী কংগ্রেস দল এককাঠি উপরে উঠে তাদের ইস্তাহারে বলছে, তারা তিন তালাক প্রথা ফিরিয়ে আনবে, মুসলিম পার্সোনাল ল-কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে, মুসলমানদের চাকরিতে আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি অনেক দাবিই পাকিস্তান গঠনের আগে জিন্নার মুসলিম লিগ ব্রিটিশ শাসকের কাছে যে দাবি করেছিল, তার সঙ্গে মিলে যায়। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এসব ভাবা যায় না। পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের জেহাদি গোষ্ঠী এবং আফগানিস্তানের তালিবানরা পর্যন্ত এত শক্ত ভাষায় ভারত-বিরোধিতা করার সাহস পায় কোথা থেকে? চীনের কোনো রাজনৈতিক নেতা তিব্বতের থেকে চীনের কর্তৃত্ব লাঘব করার কথা বলতে সাহস পাবে কি? অথবা, সেকথা বলার পর সেই নেতার আর কোনো হদিশ পাওয়া যাবে কি? অথচ, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারবিরোধী দলগুলি তথাকথিত বিরোধী রাজনীতির নামে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতার বিরোধিতা করছে শুধুমাত্র গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে। ইংল্যান্ড, আমেরিকায় এভাবে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করা যায় না। এ বিষয়ে ভারতের দেশের একশ্রেণীর সাবাদমাধ্যম তাদের কায়েমি স্বার্থের কারণে এইসব রাজনৈতিক দলের প্রচারকে তোল্লা দেয়।

কমিউনিস্টদের হিন্দুভোট ভাগ এবং ইসলামি ভোটের একত্রীকরণের কৌশল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি সংবেদনশীলতার সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্টদের জন্মলগ্ন থেকে তাদের কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করা যায়, তাহলে অবশ্য এসব নিয়ে অবাক হওয়ার কারণ নেই। ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। এই সময় তাসখন্দ ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্টির ৭ জনের যে কোর কমিটি তৈরি হয়, তার প্রধান সংগঠক ছিলেন মানবেন্দ্র নাথ রায় এবং তাঁর স্ত্রী ইভলিন ট্রেন্ট রায়। সঙ্গে ছিলেন বেশ কিছু প্রাক্তন মুজাহিদ, যারা দেশ থেকে বাইরে গিয়ে খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয়। তারপর খিলাফত ব্যর্থ হওয়ায় লেনিনের বলশেভিক দলের সংস্পর্শে আসে। এদের একাংশ গদর পার্টি গঠন করে। এদের নিয়ে মানবেন্দ্র নাথ পার্টি তৈরি করলেও তিনি চেয়েছিলেন ভারতের অভ্যন্তরের বিপ্লবী গোষ্ঠী যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি থেকে যুবক ক্যাডার সংগ্রহ করতে। কিন্তু তিনি এই দুই সংগঠনের থেকে বিশেষ কাউকে টানতে পারেননি। ফলে, প্রাক্তন মুজাহিদ মহম্মদ সফিক পার্টির প্রথম সেক্রেটারি হন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ এমপিটি আচারিয়া প্রথম চেয়ারম্যান হলেও এক বছরের মধ্যে এই মুজাহিদদের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দলের সংস্রব ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে চলে যান। এই সময় প্রাক্তন মুজাহিদরা তাদের মজহবি প্রভুত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হওয়ায় দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে তাদের আশা পূরণের অভিলাষে এই দলে যোগদান করে। মহম্মদ সফিক ছাড়াও মহম্মদ আলি এবং আরও অনেক মুজাহিদ কমিউনিস্ট দলে যোগ দেয় এবং শুরু থেকে ব্রিটিশ বিরোধিতার সুর চড়াতে

থাকে তাদের মজহবি ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য; ভারতের স্বাধীনতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য নয়। ১৯২০-২১ সালে ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য করার যে ড্রাইভ নেওয়া হয়, তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই মুজাহিদরা মহম্মদ সফিক ও মহম্মদ আলির নেতৃত্বে। এখানে যে রেজোলিউশান নেওয়া হয়, সেখানে পরিষ্কার বলা হয়, রাশিয়ান কমিন্টার্নের আদর্শে এবং প্রয়োজনে যে কৌশল ভারতের পার্টির পক্ষে যুক্তিযুক্ত, তা গ্রহণ করা হবে।

প্রাক্তন মুজাহিদদের একদল যেমন ভারতের কমিউনিস্টদের চালিকাশক্তি হলো তেমনি আরেক দল রাশিয়ার লেনিনের বলশেভিকদের কাছে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে গেল— যার বড়ো অংশ পরবর্তী সময়ে ভাড়াটে বাহিনীতে নাম লেখালো। এই মুজাহিদরা ভারত থেকে তাদের মজহবি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু করেছিল, পরবর্তীকালে তাদের সেই স্বপ্ন কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার জন্য এই দলের প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করতে লাগল। তাসখন্দ মিলিটারি স্কুলে প্রাচ্যের অনেক প্রাক্তন মুজাহিদ যারা প্যান-ইসলামিজমের বাহক, তারা যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ মুজফফর আহমেদ তাঁর আত্মজীবনী উৎসর্গ করেন দুজন প্রাক্তন মুজাহিদ আবদুল মজিদ এবং ফিরোজউদ্দিন মনসুরের নামে। তারপর ১৯২১-২২ সাল থেকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হলো মূলত মুজফফর আহমেদ, এসএ ডাঙ্গে, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার ইত্যাদির যোগদানের পর।

পটভূমিকা জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ পরবর্তী সময়ে এই কমিউনিস্ট পার্টি বারবার নীতির মোড়কে ব্যক্তিস্বার্থ ও নেতৃত্বের লিপ্সার কারণে বিভক্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেই প্রাক্তন মুজাহিদ মহম্মদ সফিকের সময় থেকে যে প্যান-ইসলামিজমের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা তলে এসেছিল, সেই মূল নীতি দেশের সব কমিউনিস্ট দলের আদর্শ হয়ে আছে। তারা শুধুমাত্র সর্বহারার কথা বললেও একমাত্র ইসলামিদের মধ্যেই সকল 'সর্বহারা'কে খুঁজে পায়। তারা ইসলাম মেনে ধর্মনিরপেক্ষতা পালন করে ফলে আজ থেকে বহু বছর আগে তাদের ইসলামি ধর্মনিরপেক্ষতার বাহক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বহু কমিউনিস্ট নেতা প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে তা সংবাদমাধ্যমে প্রচার করে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ভড়ং দেখান! অথচ, চ্যালেঞ্জ করা হলেও হিন্দু বা মুসলমান কোনো কমিউনিস্ট নেতাকে কেউ শুয়োরের মাংস ভক্ষণ করতে দেখা যায়নি। সেহরির পর রোজা পালন না করে ইফতারে রোজা ভাঙার নাটক এ দেশে প্রথম কমিউনিস্টরাই আমদানি করে। তারাপীঠ মন্দিরে মা-কালীর পূজা দেওয়ার জন্য এ রাজ্যে এক কমিউনিস্ট মন্ত্রীকে তিরস্কার করা হলেও আরেক মন্ত্রীকে হজ পালনের জন্য কিছু তো বলাই হয় না, উপরন্তু তাঁর হজ যাত্রায় রাজ্য সরকার সহযোগিতা করে।

এভাবে তোষণ করতে করতে এবং নিজেদের ভারতীয় জাতিসত্তায় বিশ্বাস না করে এই দেশের কমিউনিস্টরা তাদের শিকড়কে উপড়ে ফেলেছে। নিজেদেরকে ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ হিসেবে না দেখার কারণে এরা নির্বোধের মতো কতগুলি মারাত্মক ভুল করে বসে। তারা মুজাহিদদের প্যান-ইসলামিজমে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম লিগের সহযোগী হিসেবে হিন্দু-বিরোধী আগ্রাসী নীতির অংশীদার হয়ে পড়ে। তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি ড. গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস, যা এখনো সিপিআই ও সিপিএমের আর্কাইভসে পাওয়া যাবে, সেই বই অনুযায়ী তিনি ভারতীয়ত্ব কোনো জাতীয়তা নয়, ১৮টি জাতির একটি সমন্বয় যাদের প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে বলে দাবি করেন। যদিও স্বাধীনতার সময় ভারত বিভাজনের সময় পূর্ব ও পশ্চিমের পাকিস্তানি ভূখণ্ড তীব্র ইসলামি করে ফেলা হলো, আর বৃহত্তর হিন্দুদের আবাসস্থল, তাকে সব ধর্মের জন্য অবারিতদ্বার রেখে নেহরু চরম রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। সংবিধানে ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা প্রতিবিধান থাকলেও তা প্রশাসনিক গাফিলতিতে এবং রাজনৈতিক প্রচ্ছন্ন মদতে শুধুমাত্র মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা পাওয়ার রাস্তা করে দিল।

এভাবে অযাচিত দাক্ষিণ্যে ভারতের অভ্যন্তরে যেমন গোঁড়া ইসলামি মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল, তেমনই প্যান- ইসলামিজমের তত্ত্ব বুকে বয়ে বেড়ানো জেহাদি ইসলামির সংখ্যাও বাড়তে লাগল। কমিউনিস্ট পার্টির এক অদ্ভুত ধারণা জন্মালো যে, ভারতের অন্য সব দলের রাজনীতিকরা জাতীয়তাবোধের কথা মাথায় রেখে রাজনীতি করেন না। এই কথা আংশিক সত্যতা পাওয়ায় কমিউনিস্টরা ধীরে ধীরে তাদের প্যান-ইসলামি নীতির রূপায়ণের পক্ষে এগুতে লাগলো। ধর্মীয় সুবিধে বাড়ানোর আন্দোলন, লাভ জিহাদ ইত্যাদিতে কমিউনিস্ট এবং তাদের সম-মনোভাবাপন্ন দলগুলি তোল্লা দিতে শুরু করল।

তারপর জোট রাজনীতির সময় এই কমিউনিস্টরা কিছু আত্মকেন্দ্রিক লোভী রাজনীতিকদের বোঝাতে সমর্থ হলো যে, ইসলামিরা দলবদ্ধভাবে প্যান-ইসলামের সফল রূপায়ণের লক্ষ্যে কমিউনিস্ট এবং তাদের সমভাবাপন্ন দলকে ভোট দেবে। আবার জাতপাত ও ধর্মনিরপেক্ষতার চক্করে নাজেহাল হিন্দুদের ভোট বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ায় তা ভোট রাজনীতিতে এক নির্ণায়ক ফল দেবে। এভাবে যখন ভারতে কমিউনিস্টদের ভোট রাজনীতিতে প্রভাব, বিশেষত কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে বাড়তে লাগল, তখন ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস একটি বিশেষ পরিবারের রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের ভারত বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও নেট দুনিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বের খবরাখবর পাওয়ায় কমিউনিস্টদের গোয়েবেলসীয় প্রচারের প্রভাবে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। সেইসঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবোধ, যা সুভাষচন্দ্র বসু প্রথম আনার চেষ্টা করলেও এক সময় জওহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের দ্বিচারিতা ও ব্রিটিশ শাসকের নিপীড়নের ফলে হারিয়ে যায়। এই জাতীয়তাবোধের ধারণাই আবার ভারতীয় মননে জায়গা করে নিতে থাকে। ভারতীয় ভোটারদের মনে জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের পতনের মূল কারণ।

কমিউনিস্টদের হিন্দুভোট ভাগ এবং ইসলামি ভোটের একত্রীকরণের কৌশল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের কথা, ভারতীয় রাজনীতিতে ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বিশেষভাবে আঞ্চলিক দলগুলির জাতীয়তাবোধের চরম অভাব রয়েছে। □

বর্তমান শাসক দল শিক্ষার অন্তর্জলি সম্পূর্ণ করেছে

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

পশ্চিবঙ্গের সর্বস্তরে প্রবহমান দুর্নীতি— যেমন সারদা, নারদা কাণ্ড, গোরুপাচার, কয়লা পাচার, টাকাপাচার, রেশন চুরি, আমফানের ত্রাণ চুরি, ১০০ দিনের কাজে চুরি, আবাস যোজনায় চুরি, চাকরি চুরি ইত্যাকার বিষয়ে যুৎসই শিরোনাম খুঁজতে গিয়ে 'দুর্দম দুর্নীতি' কথাটি পূর্ববর্তী নিবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। তখনও SLST (State Level Selection Test) নিয়োগ দুর্নীতির গন্ধ বাতাসে ভেসে বেরোলেও, আদালতের রায় সামনে আসেনি। তাই, এই নিবন্ধে চুরির সাতকাহন নিয়ে সময় নষ্ট না করে 'জাতির মেরুদণ্ড' শিক্ষা ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদি পঙ্গু করার তৃণমূলি পরিকল্পনায় আলোকপাত করা যাক। আর এটা এ কারণে জরুরি যে, প্রশাসন বা সরকারের সর্বত্র এমনকী শিক্ষা ব্যবস্থায়ও দুর্নীতির অবাধ গমন। নাগরিক জীবনে তার সহনশীলতা বা উপেক্ষা বঙ্গজীবনের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি হতে যাচ্ছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হওয়া উচিত। জাতি গঠনের প্রাণভোমরা 'শিক্ষা' ব্যবস্থায় দুর্নীতি পুরাতন ব্যাধি হলেও, বঙ্গজীবন তা থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল। বাঙ্গালিদের আর যতই বদনাম থাকুক না কেন, তারা তুলনামূলকভাবে সৎ, এমন একটা ধারণা বাকি ভারতে বাঙ্গালিদের কিছুটা সম্ভ্রম আদায় করত।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে, মানুষের শুভেচ্ছা ও প্রত্যাশায় ভর করে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল ক্ষমতাসীন হয়। কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং পরবর্তীকালে বিজেপি সরকারের মুক্ত অর্থনীতির চর্চা এবং কর ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রভাবে বিপুল রাজস্ব আয়— জিএসটি কাউন্সিল এবং ফিনান্স কমিশন দ্বারা রাজ্যগুলিকে বণ্টন বা প্রদানের ফলে, অপদার্থ রাজ্য সরকারগুলিরও রাজকোষ ফুলে ফেঁপে ওঠে। ফলে রাজ্যগুলির ভোট রাজনীতির রসদ মেলে। ওই টাকা মূলধনী খাতে বা পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় না করে, অনেক রাজ্যই ভোগ্যপণ্যে এবং দান-খয়রাতিতে তা ব্যয় করছে। এতে গরিব মানুষের কিছু স্বাচ্ছন্দ্য মিললেও, আর্থিক উন্নয়ন হচ্ছে না। বিনা পয়সায় রেশন বিলিতে অনাহারে মৃত্যু কমছে, কিন্তু গ্রামীণ আর্থিক উন্নয়ন বা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়নি, সম্পদ সৃষ্টি হয়নি।

দুর্নীতির বর্তমান ঘূর্ণাবর্তে বাঙ্গালি দিশেহারা, দেশে-বিদেশে মর্যাদাহারা, ভবিষ্যৎ

অনিশ্চিত ও ঘোলাটে। তার বড়ো কারণ পশ্চিমবঙ্গে সরকার ও প্রশাসনের অনুমোদনে ও প্রশ্রয়ে দুর্দম দুর্নীতি বহাল হয়েছে। এই ফাঁদ থেকে বের হওয়া যখন সম্ভব মনে হচ্ছে, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কপটতার আশ্রয় নেওয়ায়, মানুষের শেষ ভরসাটুকু হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর বাড়ি থেকে এবং সরকারের ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে সিসি ক্যামেরায় কোটি কোটি টাকা উদ্ধার এবং ব্যাংক কর্মীদের দিয়ে কাউন্টিং মেশিনে গণনার ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছে, তখন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে 'কেউ পকেটে করে নিয়ে গিয়ে ওই টাকা রাখেনিতো'? যখন সন্দেশখালিতে শাজাহান ঘনিষ্ঠ আবু তালেবের বাড়ির মেঝে খুঁড়ে সিবিআই এবং এনএসজি স্নিফার ডগের সাহায্য নিয়ে দেশি-বিদেশি পিস্তল খুঁজে বের করে, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবলীলায় বলে ফেলেন, 'তুমি নিজে (এজেন্সি) পাঁচটা বন্দুক পকেটে করে নিয়ে কারও বাড়িতে ঢুকিয়ে দিলে। প্রমাণ তো নেই।' দেশের দুটি অগ্রণী তদন্তকারী সংস্থাকে কালিমালিপ্ত করতে মুখ্যমন্ত্রীর রুচিতে বাধলো না। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু নিজের তদন্ত সংস্থাগুলিকেও কিন্তু scanner-এর মুখে ঠেলে দিলেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করার অভিযোগকারিণী নিজেই সংবিধানের পরোয়া করেন না। এতে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায় থাকছে? ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি চলে যাওয়ায় (সাময়িকভাবে হলেও) চাপে আছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই বলে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তির ছুড়বেন 'চাকরি খেয়েছো তুমি' বলে? এতে প্রধানমন্ত্রীর গায়ে না লাগলেও, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার প্রতি আঙুল তুললেন মুখ্যমন্ত্রী— যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, এমনকী একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক দেশে এ কাজ করা যায়? রাজদণ্ড হাতে নিয়ে স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়, স্বজনপোষণ বাঙ্গালির সমাজ জীবনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করছে— সরকার চলে গেলেও তার প্রভাবমুক্ত হতে যুগ যুগ চলে যাবে। আর, চাকরি কেনা অযোগ্য শিক্ষকদের শিক্ষাদানে বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি

হবে— ভাবুনতো? অথচ শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, মানিক ভট্টাচার্য ছাড়াও, তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীঘাটের কাকু, কুন্তল ঘোষ, অয়ন শীল, প্রশান্ত রায়, সৎ চন্দনের মতো অনেকে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এতে লজ্জিত না হয়ে উলটে মুখ্যমন্ত্রী আদালত, ইডি, সিবিআই এবং বিরোধীদের টার্গেট করছেন— ন্যূনতম দায়িত্ব বোধ বিসর্জন দিয়ে।

মমতা ব্যানার্জী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে সর্বাধিক শিক্ষক নিয়োগ হয় ২০১৪ সালের প্রাইমারী টেট পরীক্ষার মাধ্যমে ৬০ হাজার খালি পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য। তার মধ্যে ৬৫০০ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার মধ্যেই টাকার বিনিময় অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। বঞ্চিত যোগ্য প্রার্থীরা কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করার পরে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রাইমারির প্যানেল থেকে ৩৬ হাজার চাকরি বাতিল ঘোষণা করেন। সুপ্রিমকোর্ট তাতে স্থগিতাদেশ দেয়। এই বিষয়টি আদালতে এখনো বিচারাধীন। এরই মধ্যে ২২ এপ্রিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে এসএসসি-র তরফে ২৫,৭৫৩ জন SLST-2016 নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি যায়, যা রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই মামলাটিও শুরুতে বিচারপতি গাঙ্গুলির আদালতে ছিল এবং তৃণমূল এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেলে বিচারপতি গাঙ্গুলির আদেশ ৬ মাসের জন্য স্থগিত করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারা গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চের বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠায়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস শিবজ্ঞানম্— বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহ: সাব্বার রশিদিকে নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করেন মামলাটি বিচারের জন্য। বিচারপতিদ্বয় সিবিআইকে ৩ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে আদালতে রিপোর্ট পেশ করতে বলে। তদনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে শুনানির পর ২০২৪-এর ২২ এপ্রিল ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫,৭৫৩ জনের সাময়িকভাবে চাকরি যায়। এই ঐতিহাসিক রায়ে বলা হয়—

(১) লোকসভা ভোট শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে হবে।

(২) বেআইনিভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের বেতনের টাকা ৪ সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ সুদ সহ ফেরত দিতে হবে, অনাদায়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে জেলা শাসকরা।

(৩) তদন্ত চালিয়ে যাবে সিবিআই, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রয়োজনে হেফাজতে নিতে পারবে সিবিআই।

(৪) দুর্নীতি ধামা চাপা দিতে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করতে চাওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হবে।

(৫) সমস্ত OMR (Optical Mark Recognition) Sheet S.S.C.-র Website-এ প্রকাশ করতে হবে।

(৬) সিবিআই বারবার চেয়েও এসএসসি-র কাছ থেকে ওএমআর শিট পায়নি। নিয়মানুযায়ী ওএমআর ৩ বছর সংরক্ষণের কথা থাকলেও মন্ত্রীসভার অনুমোদনে তা ১ বছর পরেই নষ্ট করা হয়।

এসএসসি/সরকার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টে যায়। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৭ মে অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে ১৬ জুলাই পর্যন্ত হাইকোর্টের রায় স্থগিত করে দেয়। তদন্ত চলবে, তবে অতিরিক্ত পদে অনুমোদন দেওয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এখনই কোনো চরম ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। অর্থাৎ ভোটের মধ্যে রাজ্যকে বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিল সর্বোচ্চ আদালত।

মমতা সরকার শিক্ষায় দুর্নীতি ঢাকতে ৩৪ বছরের বাম শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলায়নের কথা তোলে। একথা ঠিক যে, বাম শাসনে প্রাইমারি শিক্ষায় এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগে স্বজনপোষণ এবং কমরেডদের পরিবারের বহু সদস্য কেউ প্রাথমিকে চাকরি পেয়েছেন বা হাইস্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দলীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসীদের বিপুল পরিমাণে নিয়োগ হয়েছে। দুর্নীতি বামশাসনের প্রথম পর্যায় থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করলেও, সংবাদমাধ্যম 'করে খাওয়া কমরেডদের' মধ্যে অনুজ পাণ্ডের মতো প্রাসাদোপম অট্টালিকা অনেকগুলি খুঁজে পেয়েছে। বামজমানায় এইসব নেতাদের অট্টালিকা ছিল হাজার হাজার যা গত ১২ বছরে তৃণমূলের শাসনে লক্ষ লক্ষ হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহহীনদের পাকা বাড়ি, হর-ঘর-জল (Jal Jeevan Mission) প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল, আয়ুষ্মান ভারত (স্বাস্থ্য), প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী প্রকল্প এবং পি.এম. কিষান প্রকল্প দ্বারা কৃষকের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজে ভুয়ো মাস্টাররোল, আবাস যোজনায় টাকা চুরি ইত্যাদি কারণে সাময়িকভাবে বরাদ্দ বন্ধ রাখায় উপভোক্তারা বঞ্চিত। হর-ঘর-জল প্রকল্পের কাজ ২০২৪-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা, অথচ পশ্চিমবঙ্গে এখনো ৩০ শতাংশের বেশি কাজ হয়নি, অথচ অন্যান্য রাজ্যে ৬০-৭০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত, গুজরাটের ক্ষেত্রে তা ৯৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১০০ শতাংশ কাজ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর সামনে উন্নয়ন এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি, সামাজিক সুস্থিতি এবং ব্যক্তি সম্ভ্রম, মহিলাদের মর্যাদা এসবের চেয়েও বেঁচে থাকার নিরাপত্তা নিয়েই মানুষ বেশি চিন্তিত। অভিযোগ, ভোটের আগে মহিলাদের হাতে সাদা থান কাপড় ধরিয়ে দিচ্ছে পাড়ার মস্তানরা, যেভাবেই হোক বুথে বুথে লিড বাড়াতে হবে। এমতাবস্থায় শিক্ষার অন্তর্জলি, বেলাগাম দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদের সুযোগ কোথায়? ভোট-কুশলীরা জানে 'Opinion Poll' ব্যক্তি-পরিসরে গোপনীয় মতামত— তা ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হতে দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে শিখণ্ডী বানিয়ে অতীতের মতো এবারেও ম্যানেজ করা যাবে, মানুষের ক্ষোভ সংগঠিত হতে পারবে না প্রাণের ভয়ে। আর ক্ষমতায় থাকলে— দুর্নীতি নিয়ে চিন্তা করার বিশেষ কারণ নেই, দু'-পাঁচশো টাকা ভাতা বাড়িয়ে দিলেই হবে, কাজ না হলে 'সাদা থান'।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাসবিহারী বসু

সায়ন্তন বসু

রাসবিহারী বসু এক বিরল প্রতিভা। একদিকে সংগঠক, অপরদিকে অভিনেতা, আরেকদিকে বিপ্লবী এবং অবশ্যই একজন দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক কর্মী। রাসবিহারী বসুর জন্ম ২৫ মে, ১৮৮০ সালে বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। পিতা বিনোদ বিহারী বসু এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী।

রাসবিহারী শিশুকাল তাঁর বোন সুশীলার সঙ্গে তাঁদের গ্রামের বাড়ি সুবলদহে কাটান। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। যার নাম বর্তমানে সুবলদহ রাসবিহারী বোস এফপি স্কুল।

বিনোদবিহারী পরবর্তী সময়ে হুগলি জেলার চন্দননগরে চলে আসেন। রাসবিহারীও পিতার সঙ্গে চন্দননগরে আসেন। এখানে রাসবিহারী তৎকালীন ডুপ্লেক্স কলেজ যা বর্তমানে কানাইলাল বিদ্যামন্দির হিসেবে প্রসিদ্ধ, সেখানে পড়াশোনা শুরু করেন। এখানে তাঁর আত্মীয় শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল দত্ত তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

পরবর্তীকালে রাসবিহারী দেরাদুনে ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটে চাকরি করেন। বাল্যকাল থেকেই বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রেখে চলতেন। প্রখর জাতীয়তাবোধ তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সূত্রেই তিনি দেরাদুনে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর জাতির প্রতি আত্মমর্যাদা এতো প্রখর ছিল যে, তিনি এই তত্ত্ব বিশ্বাস করতেন না যে মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খলজি বঙ্গ দখল করেছিল।

অনেক ঘটনা ঘটানোর পর, তিনি ১৯১২-র ২৩ ডিসেম্বর, যেদিন কলকাতা থেকে দিল্লি রাজধানী স্থানান্তর হচ্ছিল, সেদিন তিনি বসন্ত বিশ্বাসকে দিয়ে বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর দিল্লির-চাঁদনীচকে বোমা নিক্ষেপ করালেন। এই ঘটনায় হার্ডিঞ্জ মারাত্মকভাবে আহত হলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের পরিকল্পনা তিনি প্রায় সফল করে এনেছিলেন। এক বিশ্বাসঘাতকের জন্য এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। কিন্তু ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের থেকেও এক বড়ো বিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এই বিদ্রোহের মধ্যে।

এই সমস্ত ঘটনার পরে রাসবিহারী বসু ব্রিটিশ সরকারের সব থেকে বড়ো শত্রু হিসেবে ঘোষিত হলেন। কিন্তু তাঁর ছদ্মবেশ, অভিনয় দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং নিখুঁত যোগাযোগ ব্যবস্থা তাঁকে সবসময় সুরক্ষিত করেছে। এমতবস্থায় অনুশীলন সমিতির সদস্যদের

রাজা পি এন ঠাকুরের ছদ্মবেশে রাসবিহারী

সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকারীর ছদ্মবেশ নিয়ে ১৯১৫ সালের ১২ মে কলকাতা থেকে জাপানের উদ্দেশে রওনা দেন। সানুকি মারু জাহাজ জাপানের কোবেতে পৌঁছায় ৫ জুন, ১৯১৫। ৮ জুন, রাসবিহারী টোকিয়োতে পদার্পণ করেন।

কিন্তু তাঁর জাপান-যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো স্বদেশের বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। সেজন্য তিনি সাংহাই চললেন সেখানকার জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়ে শীঘ্রই জাপানে ফিরে এলেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকার গদর পার্টির ভাই ভগবান সিংহ জাপানে আসেন এবং পুলিশের নজর এড়াবার জন্য সিল্ক-ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেন। ইয়াকোহামার সিন্ধি ব্যবসায়ীরা এক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে সিল্ক ব্যবসায়ী ভগবান সিংহ ও মেডিক্যাল ছাত্র পিএন ঠাকুরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়। পরস্পর কথা বলে তাঁরা দুজনেই রহস্যের আভাস পান। রাসবিহারী পরের দিন ভগবান সিংহকে তাঁর গৃহে নৈশাহারে আমন্ত্রণ জানান। সে সময়ই তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের জানাশোনা হয়।

রাসবিহারী টাকার ব্যবস্থা করেন এবং ছোটোখাটো অস্ত্রশস্ত্র চীনা এজেন্টের মারফত স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পথে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সেই অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পেয়ে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে। রাসবিহারী তাঁর 'আমাদের সংগ্রাম' শীর্ষক লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখ

করেছেন যে, তিনি দু'জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পথে ব্রিটিশের হাতে সেগুলি ধরা পড়ে।

জাপান তখন প্রাচ্যের বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল। বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী হেরম্বলাল গুপ্তও আমেরিকা থেকে সেখানে আসেন। রাসবিহারী খবর পেলেন, লালা লাজপৎ রায় শীঘ্র আমেরিকা যাওয়ার পথে জাপানে আসছেন। জাপানে লালাজীর অনেক ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। রাসবিহারী জাপান প্রবাসী ভারতীয়দের অনেকের সঙ্গেই ততদিনে বন্ধুত্ব করে ফেলেছেন।

১৯১৫ সালের নভেম্বরে লালা লাজপৎ রায় জাপানে এলেন। ভারতীয়রা উইয়েনো পার্কে একটি বিখ্যাত হোটেল-রেস্তোঁরায় এক সভার ব্যবস্থা করলেন। বড়ো হলটি কেবল জাপানি পতাকায় সজ্জিত হলো। মিৎসুরু তোয়মা, ড. সিউমেল ওখাওয়া ও বহু জাপানি যোগ দেন। সভার উদ্দেশ্য হলো, ভারতের-মুক্তি সংগ্রামে জাপান ও জাপানিদের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত করা। লালাজীর ভাষণ আমন্ত্রিত জাপানিদের অভিভূত করলো। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ দূতাবাসের ক্রোধ বেড়ে গেল। কারণ, সভাস্থলে কোনো ব্রিটিশ পতাকা রাখা হয়নি। এই হলো পয়লা ত্রুটি। দ্বিতীয়ত, সভায় জাপানি জাতীয় সংগীত কেবল গীত হয়েছে। পিএন ঠাকুর যে রাসবিহারীর ছদ্মপরিচয় তাও সেদিন প্রকাশ পেয়ে গেল। সভায় কার্যবিবরণী ও বক্তৃতাদির বিবরণ ব্রিটিশ দূতাবাসের ক্রোধ বাড়িয়ে দিল। তাঁদের পক্ষ থেকে জাপানি পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে লালা লাজপৎ রায়, রাসবিহারী বসু ও হেরম্বলালকে অবিলম্বে বহিষ্কারের দাবি করা হলো। জাপানি পররাষ্ট্র দপ্তরকে ভারতীয় নেতাদের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ জারি করতে হলো। কিন্তু রাসবিহারী ও হেরম্ব গুপ্ত যাই ঘটুক, জাপানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। জাপানি পুলিশ-প্রধান তাঁদের পাঁচ দিনের মধ্যে জাপান ছাড়ার আদেশ দিলেন। মি. তোয়ামা এই সংকটের সময় সাহায্যের হাত নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন। জাপানি সংবাদপত্রে এই বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানানো হলো।

'টোকিয়োর সেনজিকি' স্টেশনের কাছে 'নাকামুরায়া' নামে একটি রুটির কারখানা রয়েছে। কারখানার স্বত্বাধিকারী মি. সোমা সংবাদপত্রে খবর পড়েন। তিনি তাঁর দোকানের একজন গ্রাহককে জিজ্ঞেস করে সব খবর জেনে নিলেন। মি. তোয়ামা ওই ভারতীয় দুজনকে লুকিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন জানতে পেরে মি. সোমা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর পুরানো জীর্ণ গৃহে গোপনে তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার অভিপ্রায় জানালেন।

শ্রীমতী সোমা এর পরবর্তী বিবরণও দিয়েছেন, 'আমাদের এখানে কিছুদিন থাকার পর রাসবিহারীকে তখন অন্য জায়গায় রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। ছদ্মবেশে তিনি ঘোরাঘুরিও করছেন। আমার স্বামীও ছদ্মবেশে তাঁর সঙ্গে থাকছেন। কিন্তু এভাবে তো চিরদিন চলতে পারে না। অথচ তাঁর পক্ষে একা থাকাও সম্ভব নয়। আমরা ক্রমশ ভাবিত হয়ে পড়লাম। একদিন মি. তোয়ামা প্রস্তাব দিলেন, আমরা যেন আমাদের বড়ো মেয়ে তোশিকোর সঙ্গে রাসবিহারীর বিয়ে দিয়ে তাঁকে জাপানের নাগরিক করে নিই। অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাবে আমরা প্রথমে খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন ধরেই সেকথা ভাবতে লাগলাম। মি. বোসকে ছেলের মতোই আমরা ভালোবাসি। তিনিও আমাদের মা ও বাবা বলে ডাকেন। তাঁর প্রতি আমাদের স্নেহ সম্পূর্ণ অন্যধরনের। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাও গভীর। কিন্তু তোশিকোর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়ার কথা কোনোদিনই কল্পনা করিনি। তাছাড়া তোশিকোকে কী করে বলবো? সে বালিকা মাত্র, তখনো স্কুলে যাচ্ছে।

কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারছি, আর কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। ব্রিটিশ দূতাবাসের লাগানো গোয়েন্দাদের তৎপরতা বাড়ছে। মি. বোসের সামনে ভীষণ বিপদ।

আমরা মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, তোশিকো ভারতের ৪০ কোটি মানুষের মুখ চেয়ে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিক।

শেষপর্যন্ত আমিই তোশিকোকে মি. তোয়ামার প্রস্তাবের কথা বললাম। 'তোশিকো, তুমি কি মি. বোসকে রক্ষা করতে পারো না? তোমার পক্ষে অবশ্য এটা খুব বড়ো মিশন। কিন্তু এ ভার নেওয়ার মতো আর কেউ নেই'।

তোশিকোর বিনম্র উত্তর : 'আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও, মা'।

সেই থেকে রাতদিন ভাবতে লাগলো তোশিকো। একমাস পরে মি. তোয়ামাকে উত্তর দেওয়ার সময় এল। আমি তোশিকোকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে এলাম। সে যাতে নির্দ্বিধায় তার সিদ্ধান্ত জানাতে পারে সেজন্য আমি নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তোসিকো নম্র অথচ দৃঢ় স্বরে বললো— মা, তাই হোক। আমিই তাঁর বর্ম হবো। আমি মনঃস্থির করেছি।

আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি খুশি হচ্ছি, না অখুশি সেই মুহূর্তে কিছু বুঝতে পারলাম না। মনে আছে, কেবল অশ্রুসজল কণ্ঠে বলেছিলাম, তোশিকো, এ কিন্তু আনন্দদায়ক বিয়ে হবে না। সত্যিসত্যিই কি তুমি যে কোনো প্রকারে মি. বোসকে রক্ষা করতে পারবে?

কিন্তু ব্রিটিশ দূতাবাস হাল ছাড়ল না। তাঁদের অনুসন্ধান আরও জোর কদমে চলতে লাগলো। রাসবিহারী একটির পর একটি বাসা বদল করে চললেন। বছরের পর বছর কাটতে লাগলো। ব্রিটিশ দূতাবাস থেকে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে। তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য পুরস্কারের কথাও বলা হয়েছে। মি. তোয়ামা সজাগ প্রহরায় সব দিক সামাল দিয়ে চলেছেন। কিন্তু সব সময়ে রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। এমন একজন সব সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকা দরকার, যিনি তাঁকে আগলে চলবেন। এই চিন্তা থেকেই মি. তোয়ামার মাথায় তোশিকো সোমার প্রসঙ্গ উঠে। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে তোশিকোর সঙ্গে রাসবিহারীর বিয়ে হয়। কিন্তু রাসবিহারীর বিপদ কাটতে তখনো অনেক দেরি। লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁদের দিন কাটতে লাগলো। তোশিকো পত্নীরূপে বিশ্বস্ত প্রহরীর মতো স্বামীকে রক্ষা করে চললেন। এই সদা সন্ত্রস্ত জীবনে উত্তরোত্তর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ তোশিকোর মৃত্যু হলো। অবশ্য তার আগেই ১৯২৩ সালের

জুলাইয়ে জাপানি সরকার রাসবিহারীকে স্থায়ী বাসিন্দা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তোশিকো মাত্র ২৮ বছর বয়সে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁদের একটি কন্যা ও একটি পুত্র। তেৎসু ও মসাইহিদে।

ইতিমধ্যে এক তুমুল কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। দুই ভারতীয় বিপ্লবীর সন্ধানের জন্য ব্রিটিশ সরকার যত তাগিদ দিচ্ছে, তাদের দূতাবাসও জাপানি পররাষ্ট্র দপ্তরের উপর তত চাপ বাড়াচ্ছে। এরকম সময়ে, একটি জাপানি যাত্রীবাহী স্টিমার হংকং যাচ্ছিল। ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ থেকে গুলি ছুঁড়ে তাকে থামিয়ে সেই যাত্রী জাহাজে হানা দিয়ে সাতজন ভারতীয় যাত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। জাপানে এ ঘটনার তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হলো। তাঁদের পররাষ্ট্র দপ্তর কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাতে লাগলো। ব্রিটিশ দূতাবাসে তীব্র কঠোর ভাষায় জাতীয় প্রতিবাদপত্র পাঠানো হলো। জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। আর তখনই রাসবিহারী প্রথম আবার 'কিছুটা' স্বস্তির জীবন ফিরে পেলেন।

রাসবিহারীর কর্মসূত্র অবশ্য আত্মগোপনকালেও ছিন্ন হয়নি। নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তাবোধ ফিরে এলে পর তিনি নবোদ্যমে সংগঠন শুরু করলেন। ১৯২৬ সালের ১ আগস্ট নাগাসাকিতে অল এশিয়ান পিপলস্-এর প্রথম বৈঠক বসলো। ১২ জন চীনা, ৮ জন ভারতীয়, ১ জন আফগান ১ জন ভিয়েতনামি, ১ জন ফিলিপিন ২০ জন জাপানি যোগ দিলেন। রাসবিহারী আবেগদীপ্ত ভাষণ দিয়ে বললেন, হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচ্যবাসী সভ্যতা, আধ্যাত্মিকতা সম্পদে অগ্রণী ছিল।

রাসবিহারী জাপানে একটি ভারতীয় সমিতি স্থাপন করলেন। এশিয়ার ছাত্রদের জন্য তাঁরই উদ্যোগে ১৯৩৩ সালে টোকিয়োর ভিলা এশিয়ানস বা এশীয় ভিলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি এর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। তাঁর জাপানি বন্ধুদের নিয়ে তিনি ভারত-জাপান-মৈত্রী সমিতিও গড়ে তোলেন।

সভা সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি কেবল সারা জাপানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন না, কোরিয়াও যান। তিনি অনর্গল জাপানি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। বক্তৃতা দিতে তিনি ভারত ও জাপানের মধ্যে প্রাচীন সম্পর্কের উপর জোর দিতেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন সম্বন্ধে বলতেন। ব্রিটিশের নিষ্ঠুরতার বিবরণ ব্যাখ্যা করতেন। যেখানেই যেতেন, শ্রোতৃমণ্ডলী গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কথা শুনতেন। শুনে অভিভূত হতেন। ১৯৩৪ সালে তিনি যখন কোরিয়ায় যান, সেখানকার সংস্কৃতি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর বিপুল সমাদর হয়।

প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন মাসিক পত্রিকা 'জাপান ও জাপানি'র তিনি অন্যতম প্রধান লেখক। তিনি স্বয়ং 'নয়া এশিয়া'র সম্পাদক হন। 'এশিয়ান রিভিউ' সাময়িক পত্রের সম্পাদকমণ্ডলীরও তিনি অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর 'নয়া এশিয়া'য় তিনি তীব্রভাবে ব্রিটিশের নীতিকে আক্রমণ করতেন। ভারতে ওই পত্রিকাটির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

রাসবিহারী লেখক হিসেবেও ছিলেন শক্তিশালী। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতীয় লোকসংগীত প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকখানি বই লেখেন। বিভিন্ন সময়ে রচিত ওই বইগুলি হলো— প্যানোরামিক ভিউজ অব এশিয়ান রেভোলিউশন (১৯২৯), উইটস্ অ্যান্ড হিউমার্স অব ইন্ডিয়া (১৯৩০), ইন্ডিয়া অপ্রেসড (১৯৩৩), স্টোরিজ অব ইন্ডিয়ান পিপল্ (১৯৩৫), ইন্ডিয়ান ইন রেভোলিউশন (১৯৩৫), ভিক্টরিজ অব ইয়ং এশিয়া (১৯৩৭), ইন্ডিয়া ক্রাইং (১৯৩৮), ভগবদ্গীতা (১৯৪০), ট্রাজিক হিস্টরি অব ইন্ডিয়া (১৯৪২), স্পিকিং অন ইন্ডিয়া (১৯৪২), ডন অব ইন্ডিপেন্ডডেন্ট ইন্ডিয়া (১৯৪২), স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেনডেন্স (১৯৪২), রামায়ণ (১৯৪২), ইন্ডিয়া অব ইন্ডিয়ান্স (১৯৪৩), লাস্ট সং (রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার অনুবাদ (১৯৪৩), বোস অ্যাপিলস্ (১৯৪৪)।

১৯৩৭ সালে চীন-জাপান সংঘর্ষ শুরু হলো। রাসবিহারীর পক্ষে এ একটা মস্ত বড়ো সুযোগ উপস্থিত হলো। তিনি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ গঠন করলেন। টোকিয়োর রেনবোতে ত্রিশজন ভারতীয় সমবেত হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, এশিয়া এশীয়দের জন্য, সাদা মানুষ তোমরা ফিরে যাও।

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ ক্রমশ শক্তিশালী হতে লাগলো। সারা এশিয়া যুব সম্মেলন বসলো ওই বছরই ২৮ অক্টোবর টোকিয়োতে। সারা এশিয়া যুব সম্মেলন বসলো ওই বছরই ২৮ অক্টোবর টোকিয়োতে। রাসবিহারী বসু সংগঠনের কাজে সফর শুরু করলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর কোবে, টোবাটা, সিমোনোসেকি, হাপি, ইয়ামাডুটি, হুকুকা, ওকায়ামা প্রভৃতি শহর পরিক্রমা শেষ হলো। তাঁর 'এশীয়দের জন্য এশিয়া' আন্দোলন সারা জাপানে আলোড়ন জাগালো।

রাসবিহারী--- সহায়, দেশপাণ্ডে, গুপ্ত, লিঙ্গম, রামমূর্তি, জেনাসেন, নারায়ণ প্রমুখ মোট ৭০ জন বন্ধুকে একত্রিত করলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ক'দিন পরে, ২৬ ডিসেম্বর জাপানের ভারতীয়দের এক সভা হলো। রাসবিহারী বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার ঈশ্বরদত্ত সুযোগ এসেছে বলে সানন্দে ঘোষণা করলেন। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, এই যুদ্ধের ফলে ভারতের পক্ষে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সমবেত ভারতীয়রা এককণ্ঠে সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-সহ সব রাজনৈতিক দলের জাতীয়তাবাদী নেতাকে অবিলম্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার এবং ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আবেদন জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

রাসবিহারীর দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সব অঞ্চল জাপানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসছে, সে সব জায়গায় ভারতীয়দের জীবন, সম্পত্তি, সম্মান ও মর্যাদা কীভাবে রক্ষা করা যায়, নিরাপদ রাখা যায়, প্রথমেই তাঁর মনে সেই চিন্তা এল। তিনি জাপানের প্রধান সামরিক দপ্তরের কমান্ডার-ইন-চিফ্ জেনারেল সুগিয়ামার সঙ্গে এই মর্মে এক চুক্তি করলেন যে, দখলীকৃত অঞ্চলের সব ভারতীয়দের একটি বন্ধু দেশের স্বাধীন নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। এই ভাবে ২০ লক্ষ ভারতীয়দের জীবন নিরাপদ হলো। এইভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ভিত্তিও এই সঙ্গে রচিত হয়ে গেল।

১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাপানিদের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলো। সেখানকার ব্রিটিশ বাহিনী জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। ব্রিটিশ বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সেনা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আইএনএ-তে যোগদান করার পক্ষে। ১৬ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধবন্দিদের সমাবেশে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। অন্যদিকে প্রীতম সিংহ তখন সারা মালয় ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ সম্মেলন গড়ে তোলার জন্য কাজ করে চলেছেন। মেজর ফুজিয়ারা প্রীতম সিংহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে যেমন স্বাধীনতা লিগ সংগঠনের এক নতুন সূত্র সংযোগ করেন, তেমনি আইএনএ গঠনে ও ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের সৈন্যাপত্য গ্রহণের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ১৫ জুন ঐতিহাসিক ব্যাংকক সম্মেলন শুরু হয়। সূচনায় রাসবিহারী বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে তেরঙা পতাকা উত্তোলন করেন। ব্যাংককের সিলাপ্যাকন থিয়েটারে এই মহতী সমাবেশ বসে। থাইল্যান্ডের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব বিচিত্র-বদকর্ন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। থাইল্যান্ড ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূতদের শুভেচ্ছাবাণী পঠিত হয়। রাসবিহারী সম্মেলনের সভাপতিরূপে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

সম্মেলন চলে ন' দিন ধরে। শেষ দিকে জার্মানি থেকে সুভাষচন্দ্রের বাণী আসে। তিনি তাঁর বাণীতে লেখেন, 'আমাদের সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও তাঁর বন্ধুরা প্রথম সাধারণ সভায় মিলিত হতে চলেছেন জেনে আনন্দিত হয়েছি। আমার নিজের এবং আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ইউরোপীয় শাখা কেন্দ্রগুলির পক্ষ থেকে সম্মেলনের প্রতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সম্মেলনে স্থির হয়, পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপক স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং এজন্য ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ প্রতিষ্ঠা করা হবে। লিগই এই আন্দোলন গড়ার জন্য সর্বত্র শাখাকেন্দ্র স্থাপন করবে।

পূর্ব-এশিয়ায় বন্দি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা ও অসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে ভারতীয় জাতীয় সেনাদল আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করা হলো বলে ঘোষণা করা হয়। ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ কমান্ডার ইন চিফ নিযুক্ত হন। স্থির হয়, ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য লোক, অর্থ, সংস্থান সরবরাহের ব্যবস্থা করবে এবং জাপান সরকারকে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম, জাহাজ, বিমান জোগান দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাবে পুরোপুরি ভারতীয় অফিসারদের কর্তৃত্বে থাকবে, তা এবং কেবল ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রামেই ব্যবহৃত হবে।

এই সময় রাসবিহারীকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ওজন সাংঘাতিকভাবে কমে যায়। কিন্তু তিনি সেজন্য বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে নতুন করে আইএনএ-কে গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি এক প্রশ্নমালা প্রচার করেন। ব্যাংককে তখন আনন্দ মোহন সহায়ের নেতৃত্বে একটি ছোটো অফিস চলতে থাকে। এসময়ই ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু জনের মনেই সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ করে আনার ইচ্ছা জাগে। জেনারেল মোহন সিংহের ব্যাপার নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে প্রবাসী ভারতীয়দের মনেও অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। রাসবিহারী ঠিক এই পর্যায়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ ও সামরিক প্রতিনিধিদের এক যুগ্ম সম্মেলন ডাকেন। ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে সিঙ্গাপুরে এই বৈঠক বসে।

সিঙ্গাপুর সম্মেলনের আগে ও পরে রাসবিহারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নানাদিকে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। তিনি যে একনায়ক নন, অবিমিশ্র সেবক এবং দেশের স্বাধীনতাই তাঁর মূলমন্ত্র, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে তা নতুন করে অভিব্যক্ত হয়। তিনি সুভাষচন্দ্রকে বার্লিন থেকে আনাবার ব্যবস্থা করার তোড়জোড় শুরু করলেন। জাপান সরকারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হলো এবং শেষপর্যন্ত একটি সাবমেরিনে করে সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের ১৩ জুন তাঁর একান্ত সচিব কর্নেল আবিদ হাসানকে নিয়ে সিঙ্গাপুর হয়ে টোকিয়োয় এসে পৌঁছলেন।

এখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাসে নবতর অধ্যায় শুরু হলো। টোকিয়োতে রাসবিহারীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ঘটলো। পরে যথারীতি আনুষ্ঠানিকভাবে লিগের সদস্যদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। ঘটনাবলী দ্রুত আবর্তিত হয়ে চললো। অবশেষে সেই ঐতিহাসিক দিন এল। ১৯৪৩-এর ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরে ক্যাথে সিনেমা ময়দানে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয়দের সমক্ষে রাসবিহারী বসু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও সম্পদ ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়ে বলেন, 'আমি আপনাদের জন্য এই উপহার নিয়ে এসেছি। এই আমাদের নেতাজী। ভারতের যা শ্রেষ্ঠ ও মহোত্তম সম্পদ, তারই প্রতিভূ সুভাষচন্দ্র। যা প্রিয়তম যা পরম গতিশীল, তিনি তারই প্রতীক'।

রাসবিহারীর স্বাস্থ্য ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়ছিল। জাপানে তিনি বিশ্রাম নিতে লাগলেন। অবসর জীবনেও স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তাঁর আগ্রহ বিন্দুমাত্র কম হয়নি। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তিনি আইএনএ সর্বাধিনায়ক নেতাজীকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং টোকিয়োতে জাপানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু বার্ধক্যে ও হৃদরোগে তিনি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। তারপর ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি টোকিয়ো শহরে এই চিরবিপ্লবী মহাপ্রয়াণ করলেন।

রাসবিহারী ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভার জাপান শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকরের সঙ্গে রাসবিহারীর পত্রাচারের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সাভারকরের অনুরোধে, তিনি হিন্দু মহাসভার জাপান শাখার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সভাপতি হন। সাভারকরের সঙ্গে তাঁর বন্ধন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ৫৯ বছরের জীবনকাল প্রায় আধাআধিভাবে জন্মভূমি ভারতবর্ষে কেটেছে ২৯ বছর, আর বাকি ৩০ বছর কেটেছে তাঁর কর্মভূমি জাপানে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়।

ভোট দেওয়ার আগে একবার ভাবুন

ভারত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। আমাদের দেশে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেন। করোনা অতিমারির সময়ে গোটা বিশ্ব যখন টালমাটাল, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধি, সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে দেশবাসীকে রক্ষা করেছেন। একশো ত্রিশ কোটি মানুষকে বিনা পয়সায় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দিয়েছেন আর দিয়েছেন বিনা পয়সার চাল। অর্থনৈতিক দিক থেকেও প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান যখন দেউলিয়া হয়েছে তখন ভারত কিন্তু বিশ্বের চতুর্থ স্থান দখল করেছে। দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত, পরিবার তান্ত্রিক নেতা-নেত্রীরা যখন অশুভ জোট গঠন করে দেশটাকে লুটে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, তখন ছাপান্ন ইঞ্চির ছাতি, দাড়িওয়ালা যোগীপুরুষ দেশ ও দেশবাসীর রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ভারত থেকে দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্রকে খতম করে এক আত্মনির্ভরশীল শক্তিশালী দেশ গঠন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন।

এবারের লোকসভা ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লোকসভা ভোটে মোদী সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল জনসমর্থন পেলে এই রাজ্যের অপশাসনের, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের হাত থেকে শীঘ্রই রাজ্যের মানুষ মুক্তি পাবেন। তাই তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আগে একবার ভেবে দেখা দরকার— (১) আপনার বাড়ির বেকার ছেলের চাকরি নেই, (২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, (৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে লাগাম ছাড়া দুর্নীতি, (৪) আবাস যোজনার টাকা চুরি, (৫) ১০০ দিনের কাজের টাকা চুরি, (৬) জঙ্গল কেটে গাছ চুরি, (৭) যুব সমাজের হাতে ২৮ টাকার পাউচ ধরিয়ে দেওয়া, (৮) ভাতা, ভিক্ষা, মেলা, খেলার নামে সরকারি অর্থের মোচ্ছব করা, (৯) রাজ্যের মাথাপিছু বিপুল পরিমাণ ঋণ প্রায় ৬০,০০০ টাকা, (১০) মা-বোনেদের সম্মান, ইজ্জত নিয়ে খেলা হচ্ছে, (১১) গরিব মানুষের রেশনের চাল চুরি, (১২) শৌচাগারের টাকা চুরি, (১৩) শিল্প কারখানা নেই, (১৪) অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক ইলেকট্রিক বিল বেশি, (১৫) ঢালাও মদ ও লটারি বিক্রির লাইসেন্স প্রদান। সর্বোপরি সাধারণ মানুষের কোনো সরকারি পরিষেবা নিতে গেলে তৃণমূলের নেতাদের কাটমানি দিতেই হবে।

আর অন্যদিকে মোদী সরকার দেশের সাধারণ মানুষকে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। (১) এক দেশ এক ভোট, (২) এক দেশ এক আইন, (৩) আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিশালী ভারত, (৪) বিনা পয়সায় রেশন, (৫) দুর্নীতিমুক্ত ভারত, (৬) কৃষক-সম্মাননিধি প্রদান, (৭) মহিলাদের সম্মান প্রদান, (৮) হর-ঘর-জল প্রকল্প (জল জীবন, জল মিশন), (৯) সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষের নাগরিকত্ব প্রদান, (১০) দুকোটি গরিব মহিলাদের বিনামূল্যে গ্যাস প্রদান, (১১) প্রতিটি বাড়িতে পাকা শৌচালয়, (১২) বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, (১৩) সুকন্যা সমৃদ্ধি, (১৪) অটল পেনসন যোজনা, (১৫) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ইত্যাদি। তাই এই ভোট দেশ গঠনের ভোট। তৃণমূল-সহ অন্যান্য বিরোধী দলকে ভোট দেওয়ার অর্থ দুর্নীতিগ্রস্ত ও পরিবার তান্ত্রিক লুটের দলকে সমর্থন করা। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালিদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাই আপনার ভোটাধিকার আপনি সুস্থ গণতান্ত্রিক, শক্তিশালী দেশ, গঠনের জন্য প্রয়োগ করুন এবং মোদী সরকারকে জয়যুক্ত করুন।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

কাশ্মীর সমস্যা ও কংগ্রেসের ব্যর্থতা

দেশ বিভাগের সময় দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির প্রশ্নে রাজার ইচ্ছাকেই শেষ কথা হিসেবে সর্বসম্মতভাবে স্থির করা হয়েছিল। পাকিস্তানের আক্রমণের মুখে কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর। সেই সময় পাকিস্তান কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ দখল করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি হয়। কিন্তু যুদ্ধ আজও শেষ হয়নি। জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে জঙ্গি হামলায় এক বায়ুসেনার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ফের পুরানো খেলায় মেতেছে কংগ্রেস স্রেফ রাজনৈতিক ফায়দা তোলার লক্ষ্যে। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয়ে অতর্কিত পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি হামলায় ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। সেই নৃশংস ঘটনার দ্রুত জবাব দিয়েছিল ভারত পাকিস্তানের বালাকোটে জঙ্গি ডেরায় বিমান হামলা চালিয়ে।

২০১৯-এর নির্বাচনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী পুলওয়ামার পাশাপাশি ফ্রান্স থেকে রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রচার চালিয়েও সফল হয়নি। বর্তমানে জঙ্গিরা অনেকটাই কোণঠাসা, শ্রীনগরে জি-২০ গোষ্ঠীর সম্মেলন নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে বছরে দুই কোটির বেশি। সুতরাং জয়রাম রমেশ যতই জম্মু-কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর কৃতিত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করুন না কেন, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা,
কোচবিহার।

পুঁথিগত শিক্ষার চেয়েও জরুরি সামাজিক শিক্ষা

মানুষ তার জীবনে সামাজিক শিক্ষা পরিবার ও সমাজ থেকে পায়। পুঁথিগত বিদ্যায় অনেক জ্ঞান থাকলেও সামাজিক শিক্ষা না থাকার জন্য অনেক মানুষ জানে

না কোন সমস্যা কীভাবে সমাধান করবে, কোন ঘটনায় কী আচরণ করবে, কোন কথায় কী প্রতিক্রিয়া দেবে। এসব না জানার কারণে অনেক মানুষ জীবনে খুব বিপদে পড়েন। যারা স্বার্থপর বা কেরিয়ারিস্ট, তাদের ফোকাস যেহেতু নিজের লক্ষ্যে থাকে, তাই তারা কেবল নিজেকে নিয়েই ভাবে। তারা সামাজিক বা পরিবারগত ভাবে সফল হন না।

হিন্দুদের সামাজিক মঞ্চ থাকলেও তাতে অংশগ্রহণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, সর্বোপরি দেশ সম্পর্কে তাদের আলোচনার পরিধি খুব কম। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে তাদের জ্ঞানও কম। হিন্দুদের মধ্যে অতিচালাকরা ভোট না দিয়েও সরকারের সমালোচনা করে থাকেন। যা তাদের অধিকারের মধ্যেই পড়ে না। রাজনীতি সেই হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের স্বার্থে। আর হিন্দু গুরুরা রাষ্ট্রসচেতন নন। তারা ভাবতেই পারেন না যে দেশে রাষ্ট্রবাদী সরকার না থাকলে তাদের ধর্মাচরণ, গুরুগিরি সব বন্ধ হয়ে যাবে। চট্টগ্রামের এক বৌদ্ধ গুরু, যার আশ্রমে সব ধর্মের লোকেরা আসে, সেই গুরু তার শিষ্যদের বলেন, রাত ২টায় উঠে প্রার্থনা (তৌহিদ নামাজের অনুকরণে) করে গুরুকে মিসড কল দিতে। গুরু খেয়াল রাখেন, কতজন তার আদেশ মানছে। সবাই গ্রাজুয়েট এমন এক পরিবার ১৫ বছর ধরে সাইকো গুরুর আদেশ মানতে গিয়ে, ৩ ঘণ্টার বেশি এদের ঘুম হতো না। গুরু বলেছেন, তৌহিদ নামাজ পড়লে, মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। অর্থাৎ লোভের বা সমস্যার সমাধানের আশায় গুরুর আদেশ মানতে হবে। এরা নানা রোগে আক্রান্ত, না ঘুমানোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়। আমি এদের গুরুর ভুল ধরিয়ে দেওয়াতে, আমার উপর তারা ক্ষুব্ধ। নিজেকে পরিবার, সমাজ, দেশকে উন্নত ও সুখী করতে চাইলে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের তৈরি করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সাঁতার না জানলে গভীর জলে পড়লে ডুবে যাবে, এই সহজ সত্য যারা জানার সুযোগ পেয়েছে, তারাই অকালে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে বা সাঁতার শেখে। একটি পুস্তকে পড়েছিলাম, হিন্দুদের দিব্যজ্ঞান আছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমি বলি, হিন্দুদের পুঁথিগত বিদ্যা আছে, ব্যবহারিক জ্ঞান নেই।

—মৃণাল মজুমদার,
বার্লিন, জার্মানি।

রোহিঙ্গাদের অবিলম্বে দেশ থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপস্থিতি আগামী দিনে হিন্দু ও হিন্দুত্বের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে কৌশলে কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করা হয়েছে ঠিক সেই অপকৌশল সামনে রেখে হিন্দুদের উৎখাত করে পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর 'ইসলামিক বাংলা' তৈরি করবার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে জারি হয়ে গেছে। আগামীদিন হয়তো রোহিঙ্গা জেলা অথবা রোহিঙ্গা স্থান গঠনের দাবি জোরদার হবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতে মায়ানমার থেকে এদেশে, এরাজ্যে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলমানরা ইতিমধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, ইতিমধ্যে তারা এদেশের ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড সংগ্রহ করেছে এবং বিভিন্ন নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলকে প্রতিহত করবার জন্য এই রোহিঙ্গা অপশক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে রিগিং, বুথ জ্যাম এবং ছাপ্পাভোট দিতে দেশের অভ্যন্তরে এই রোহিঙ্গা অপশক্তি দাপিয়ে বেড়িয়েছে একথা প্রমাণিত সত্য। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে অর্থাৎ ২০১১ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর 'ইসলামিক বাংলা' তৈরি করবার নেপথ্যে কারিগর তৃণমূল কংগ্রেস। যাদের অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে জেলে থাকার কথা। তারাই এখন এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। অবিলম্বে এ রাজ্যের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা রোহিঙ্গা অপশক্তিকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন, এ রাজ্যে রোহিঙ্গা অপশক্তি আগামীদিনের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর একটি প্রশ্ন চিহ্ন। অতি দ্রুত যদি নির্মূল করা না হয় তাহলে আগামীদিন পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুশূন্য হতে বেশি সময় লাগবে না। একথা পরিষ্কার যে, হিন্দু ও হিন্দুত্বের তীব্র বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। এই দুইয়ের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলা তৈরি করবার অপপ্রচেষ্টা ইতিমধ্যে জারি হয়ে গেছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি এক এক করে হিন্দুশূন্য হতে শুরু করেছে। সন্দেশখালির মাটিতে দাঁড়িয়ে শেখ শাজাহান বাহিনী যে সন্ত্রাস চালিয়েছে তা দেখে সমগ্র দেশ লজ্জিত। হিন্দু ও হিন্দুত্বকে ধ্বংস করবার জন্য এই ধরনের অপশক্তিগুলি প্রথমেই মাতৃশক্তির উপর নির্লজ্জ আক্রমণ এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতা শুরু করে। সন্দেশখালির ঘটনা আজ প্রমাণিত কিন্তু এরাজ্যের আনাচে-কানাচে যে এরকম বহু সন্দেশখালি রয়েছে তা এখনো প্রচারের আলোয় আসেনি।

কেন্দ্রে তৃতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে একথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আগামী রাষ্ট্রবাদী সরকারের কাছে বিনম্র চিত্তে আবেদন থাকছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুদের যাতে দ্বিতীয়বারের জন্য উদ্বাস্তু হতে না হয় বাস্তুচ্যুত হতে না হয় তার জন্য রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম দিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। আশা রাখি আগামী রাষ্ট্রবাদী সরকার পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষ বিপন্ন রাজ্যের দৃষ্টিতে দেখে দেশের সার্বভৌমিকতার প্রশ্নে দেশের অখণ্ডতাকে সামনে রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা অপশক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজরোড, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

মহিলাদের উপযোগী যোগাসন

নিবেদিতা কর

শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই মহিলাদের স্বাস্থোন্নতির জন্য যোগাসন একটি অন্যতম হাতিয়ার। মহিলাদের জন্য যোগাসন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা শরীরের ওজন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকে। নানা কারণে মহিলাদের ওজন বৃদ্ধি পায় এবং ব্যায়াম তাঁদের এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক। শারীরিক পরিশ্রম কম হলে ৪০ বছরের বেশি বয়সি মহিলাদের স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধির আশঙ্কাও বাড়ে। হার্টের সমস্যা, ডায়াবেটিস (ব্লাড সুগার), আর্থ্রাইটিস ইত্যাদির মতো স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলি দূরে রাখার জন্য মহিলাদের নিয়মিত যোগাসনের দ্বারা তাদের শরীরকে সক্রিয় রাখতে হবে। মেয়েদের পিরিয়ডের বিভিন্ন সমস্যায় যোগাভ্যাস খুব ভালো ফল দেয়। অনেকের অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যা দেখা দেয়। কারও দীর্ঘদিন পরপর, কারও আবার ঘনঘন পিরিয়ড হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। এছাড়া অতিরিক্ত রক্তস্রাব, পিরিয়ডের সময় অতিরিক্ত ব্যথা ইত্যাদি সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

মেন্সট্রুয়াল ক্র্যাম্প কমাতে সাহায্য করতে পারে ফরোয়ার্ড ফোল্ড ও ফিশ পোজের মতো আসন। বাটারফ্লাই পোজ আসনটি রোজ করলে মেয়েদের পিরিয়ডস্ নিয়মিত হবে। মেয়েদের শরীরের পেশী এই ব্যায়ামের মাধ্যমে হয়ে ওঠে শক্তিশালী। নিয়মিত যোগাসন মহিলাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত মাসিক চক্রের সঙ্গে যুক্ত, কারণ এটি নারী দেহে সামগ্রিক হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে, শারীরিক স্ট্রেস কমায়। এই স্ট্রেস হলো মেয়েদের অনিয়মিত চক্রের একটি কারণ। সূর্য নমস্কার প্রাচীন কাল থেকে ভারতের একটি পরিচিত ব্যায়াম। এই ব্যায়ামটি পেট ও কোমরের চর্বি কমায়। রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। মহিলাদের পিরিয়ড নিয়মিত করে। বিড়ালাসন শরীরের পেশীকে শক্ত করে। শরীরের পশ্চার ও ব্যালান্স ঠিক করে। এই আসন টেনশন কমায় ও মন শান্ত করে। পিঠের ব্যথা সারাতে সাহায্য করে। মেন্সট্রুয়াল ক্র্যাম্প কমায়। ফলে পিরিয়ডের ব্যথা কমে। ত্রিকোণাসনের ফলে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ উপকৃত হয়। পেটের মেদ ঝরাতে এই আসনটি অত্যন্ত উপকারী। মেনোপজের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। মেরুদণ্ড, হিপ, পিঠ, বুক ও কাঁধের পেশীকে শক্তিশালী করে। শারীরিক শক্তি ও সক্ষমতা বাড়ায়। অষ্টবক্রাসন বাহু ও কবজিকে শক্তিশালী করে। পেটের মাংসপেশীগুলোকে শক্তিশালী করে এবং চর্বি কমায়। মনোযোগ ও দৈহিক-মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখে। মহিলাদের মাসিক বিকৃতি দূর করে এবং মেনোপজ হওয়ার পর যেসব জটিলতা দেখা দেয় সেগুলো থেকে মুক্তি দেয়। চক্রাসন মেরুদণ্ডের হাড়কে নমনীয় করে যৌবন ধরে রাখতে সাহায্য করে। শরীরে স্ফূর্তি, শক্তি ও তেজ বৃদ্ধি করে, কোমরের ব্যথা দূর করে। নারীদের গর্ভাশয় জনিত বিকারকে দূর করে। গোমুখাসন স্ত্রীরোগের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী এবং সন্ধি বাত, গেঁটে বাত দূর করে। শীর্ষাসন হচ্ছে আসনের রাজা। এতে মস্তিষ্ক শুদ্ধ রক্তপ্রাপ্ত হয়, যার ফলে চোখ, কান, নাক ইত্যাদি সুস্থ থাকে। পিটুইটারি ও পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে সুস্থ রাখে এই আসন। স্মৃতি, মেধা বিকশিত করে। অসময়ে চুল পড়ে যাওয়া ও পেকে যাওয়া বন্ধ করে।

যোগাসন শুধুমাত্র মাসিকের ক্র্যাম্প এবং পেশীর ব্যথা থেকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, এটি নিয়মিত মাসিক চক্রকেও নিশ্চিত করতে পারে। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় দেহে নানা হরমোনের ভারসাম্য বজায় রেখে, স্ট্রেসের মাত্রা কমিয়ে, প্রজনন অঙ্গ-সহ শরীরের সমস্ত অংশে অক্সিজেন ও পুষ্টির প্রবাহকে সচল রেখে যোগাসন জরায়ু, শ্রোণী ও পিঠের নীচের অংশকে শক্তিশালী করে এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি করে। মানসিক চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে যোগব্যায়ামের সঙ্গে ধ্যান বা মেডিটেশন ও প্রাণায়াম গুরুত্বপূর্ণ। যোগব্যায়ামের শারীরিক অনুশীলন একাগ্রতা, মনোযোগ বৃদ্ধি করে। প্রাথমিক স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত যোগাসন করলে দীর্ঘমেয়াদি উপকার পাওয়া যায়। যোগানুশীলন রক্তে সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়ায়, যা বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ মোকাবিলায়, সুস্থ মেজাজ বজায় রাখতে বিশেষ ভাবে কার্যকর। বার্ধক্যের ক্ষেত্রে ও অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে, হাড়ের স্বাস্থ্য বা বোন ডেন্সিটি রক্ষায় ওয়ারিয়র পোজ, ট্রায়াঙ্গল পোজ, ডাউনওয়ার্ড ডগের মতো ভঙ্গির ব্যায়াম বিশেষ কার্যকরী। মেয়েদের মাসিকের সময় চার-পাঁচ দিন কোনো আসন করা চলবে না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পেটে চাপ পড়ে এমন যোগাসন অভ্যাস করা নিষেধ। □

ধূমপান : নারী, পুরুষ ও শিশুর উপর প্রভাব

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মফস্‌সল থেকে কলকাতায় পড়তে এসে আমার প্রথম মেয়েদের সিগারেট খেতে দেখা। ইদানীং ধূমপানে পুরুষদের একচেটিয়া দখলদারিতে ভাগ বসিয়েছে মহিলারা। পরিসংখ্যান বলছে, পৃথিবী জুড়ে যখন ধূমপানের প্রবণতা কমছে, তখন মহিলা ধূমপায়ীদের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ধূমপানের নিরিখে মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা ছিল না বললেই চলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহিলা ধূমপায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যারপরনাই চিন্তিত। আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পরিচালক মেরি আসুন্টার মতে, সিগারেট হাতে থাকলে মেয়েরা নিজেদের অনেক বেশি আধুনিকা মনে করে। তাদের মনে হয় প্রকাশ্যে ধূমপান মেয়েদের ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রকাশের সূচক।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব বলছে, বাংলাদেশের মতো ইসলামিক দেশেও মহিলা ধূমপায়ীদের সংখ্যা বাড়ছে, বর্তমান এই হার হলো ২৮ শতাংশ। ইদানীং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা বেড়ে চলেছে। এই দেশগুলিতে মহিলা ধূমপায়ীদের শতকরা হার ১.৪ থেকে বেড়ে ২.৯ হয়েছে।

ধূমপানে মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব কী কী?

(১) **ভ্রূণের উপর প্রভাব :** মায়ের ধূমপানের কারণে ভ্রূণের ফুসফুস সঠিকভাবে বিকশিত হয় না এবং মৃত সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(২) **প্রি-মেন্সটুয়াল সিনড্রোম :** গবেষণার ফল জানাচ্ছে, ধূমপান মহিলাদের পিরিয়ডের সময়ে ক্র্যাম্প ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। ধূমপান না করা মহিলাদের তুলনায় ধূমপান করা মহিলাদের এই সমস্যা দুই-তিনদিন বেশি স্থায়ী হয়।

(৩) **প্রজননের উপর প্রভাব :** ধূমপানের সময়ে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যে ধোঁয়া শরীরের ভিতর প্রবেশ করে তার মধ্যে কিছু রাসায়নিক মহিলাদের জন্য খুব বিপজ্জনক। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ধূমপানের ধোঁয়ায় ৪০০টি রাসায়নিকের মধ্যে ২৫০টি ক্ষতিকর, আবার তার মধ্যে ৫০টি রাসায়নিক শুধু ক্যান্সারের জন্য দায়ী।

(৪) **ফুসফুসের রোগ :** ক্ষতিকর নিকোটিন ছাড়াও সিগারেটে অনেক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড, সায়ানাইড অন্যতম। দীর্ঘদিন ধরে তামাক সেবনের ফলে এই বিষাক্ত রাসায়নিকগুলি ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিসাধন করে।

(৫) **কার্ডিওভাসকুলার রোগ :** এটি হলো হৃদপিণ্ড এবং সংলগ্ন শিরা ও ধমনীর রোগ। তামাকের মধ্যে থাকা কিছু উপাদান শরীরের রক্তনালীগুলিকে সংকীর্ণ করে দেয়, ফলে রক্ত সঞ্চালনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ব্লকেজের মাত্রা বাড়তে থাকে। মার্কিন গবেষকরা জানাচ্ছেন, ধূমপানের ফলে হার্ট ও পেশীর কোষ বিভাজন মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে হৃদপিণ্ডের আকারের বিকৃতি পর্যন্ত ঘটতে পারে।

(৬) **কিডনির রোগ :** ধূমপানের ফলে কিডনির ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কিডনি ক্যানসারের ঝুঁকি বেশি কয়েকগুণ বেশি।

(৭) **মুখ গহ্বরের রোগ :** চিকিৎসকদের মতে মুখের ভিতরে ক্যানসারের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ধূমপান। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, রং বদলে যাওয়া ছাড়াও ধূমপানের কারণে মুখের মধ্যে লিউকোপ্লাফিয়া' নামক জটিল রোগ দেখা যায়। এছাড়া আরও অনেক শারীরবৃত্তীয় সমস্যার জন্য ধূমপান অনেকাংশে দায়ী। তার মধ্যে অন্যতম হলো, যৌন দুর্বলতা, অত্যধিক মানসিক চাপ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, ব্রেনের ক্ষতি।

ধূমপায়ীরা বলেন, 'সিগারেট সুখ টান', ডাক্তাররা বলেন, 'সিগারেটে অসুখ টান।' যাই হোক না কেন, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে মেয়েদের সিগারেট খাওয়ার প্রবণতার বৃদ্ধিতে চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন। □

আত্মত্যাগ ছাড়া যে কোনো লড়াইয়ে শাশ্বত জয় সম্ভব নয়, তা রাসবিহারী বসু ভারতবাসীকে, এমনকী বিশ্ববাসীকেও বুঝিয়ে দিয়েছেন।

সস্ত্রীক রাসবিহারী বসু

স্বাধীনতার জন্য বিদেশে থেকে তিন দশক সংগ্রাম চালিয়েছেন রাসবিহারী বসু

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'বসু' অর্থে 'অষ্টবসু' নামে আটজন মৌলিক দেবতা, যারা বিবিধ প্রাকৃতিক দিকে অবস্থান করে সৃষ্টির রক্ষাকর্তা উজ্জ্বল গণদেবতায় পরিণত হয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন সূর্য, চন্দ্র, প্রভাস বা আকাশ, ধ্রুব বা নক্ষত্র প্রমুখ। কেউ কারও দ্বারাই আচ্ছাদিত নন, অপূজ্য নন। সকলেই প্রকাশিত, উপাস্য এবং আরাধ্য দেবতা। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং রাজনীতির পরিমণ্ডলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কিংবা মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু— কেউ কারও দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারেন না। যদি আচ্ছাদন থেকেই থাকে, তবে তা আমাদেরই পক্ষপাতদুষ্ট নেত্রপল্লবে।

'কালী হলি মা রাসবিহারী/নটবর বেশে বৃন্দাবনে/পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব,/কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী।' এ একটি রামপ্রসাদী গান। ভগবান কৃষ্ণই যে 'রাসবিহারী' সেই প্রথম শুনলাম। তার আগেই রাসবিহারী বসুর নামটি শুনেছি। তাঁর জীবনী পাঠ করে শুনিয়েছেন বাবা। শুনেছি তাঁর নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করার রোমহর্ষক লোকায়তিক কাহিনি, যা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তখন থেকে এবং পরবর্তী যৌবনে একটা ধারণা জন্মাচ্ছিল, ঈশ্বরপ্রেম, দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ইত্যাদি 'প্রেম'-মূলক নানান অনুভূতি বোধহয় অভিন্ন। ছোটোবেলায় সবারই একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে যেখানে চিন্তাচেতনার যাবতীয় চিত্রকল্প মনের মধ্যে রচনা হতে থাকে। বাড়ির যা পরিবেশ ছিল, তাতে দেবতা, মহামানব আর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক একটি অনবদ্য আসন পাতা ছিল। রাসবিহারী বসুর ছদ্মবেশ ধারণ করে ইংরেজদের চোখে ধুলো দেওয়াটা তখন মনে হয়েছিল মা কালীর রাসবিহারী রূপ পরিগ্রহণ, এতটাই নিখুঁত। রাসবিহারীর ছদ্মবেশ ধারণের রোমহর্ষক বর্ণনা শুনে শিশুমনে যে নানান চিত্রকল্পের উদয় হয় তা এমনতরো। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, গুপ্ত বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, দেশের জন্য লড়াই তখন আমাদের কাছে একটি অভূতপূর্ব অনুভূতি এনে দিত। ছোটোবন্ধুরা খেলাচ্ছলে জিজ্ঞেস করতো কেউ, কার মতো বিপ্লবী হতে চাই? কেউ নেতাজীর কথা বলতো, কেউ অরবিন্দ, কেউ মাস্টার দা। আমার মনে নিঃসন্দেহে রাসবিহারী বসুর নামটি আসতো। ভারতবর্ষের বাইরের কোনো দেশকে যদি ছোটোবেলা থেকে ভালোবেসে থাকি, তা হচ্ছে জাপান। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে

অসীম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েও রাসবিহারীকে কখনও কম শ্রদ্ধা করতে শিখিনি। পরে যতই রাসবিহারী সম্পর্কে উদাসীনতার সামাজিক ছবি দেখেছি, ততই রাসবিহারীর উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। অশেষ কষ্ট সয়ে বিদেশে থেকে ভারতবর্ষের জন্য তিন দশক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নজির আর কোন বিপ্লবীর রয়েছে?

১৯১২ সালে দিল্লি এবং ১৯১৩ সালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় নানান অনুসন্ধান করে ব্রিটিশ সরকার জানতে পারে মূল পাণ্ডা রাসবিহারী। তখন তাঁর মাথার দাম ধার্য হয় ১২ হাজার টাকা। তবুও তিনি অধরা। মাথার দাম আরও বাড়লো ৫ হাজার টাকা। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ; হাটে, জনপদে, স্টেশনে-স্টেশনে ছবি-সহ পোস্টারে ছয়লাপ। না, তবুও তাঁকে ধরা যাচ্ছে না। ছদ্মবেশ ধারণ করছেন নিখুঁত ভাবে। নানা নামে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং গুপ্ত বিপ্লবের কাজ সংঘটিত করে চলেছেন ভারতবর্ষের নানান জায়গায়। কখনও সন্ন্যাসীর বেশ, কখনও শ্রমিক কারিগর, দারোয়ান, কাজের লোক, কখনও নারীর বেশ কখনো মেথরের। তারই মধ্যে এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৪ সাল। পরিস্থিতি বুঝে এবার সেনাবাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টা চালালেন, যাতে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম সুযোগ নেওয়া যায়। দিল্লি, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, আম্বালা, মীরাট, জব্বলপুর, বারাণসী, দানাপুর প্রভৃতি স্থানের সেনাছাউনিগুলিতে বার্তা পৌঁছাতে লাগলেন। কিন্তু না, ১৯১৫ সালে জনৈক সদস্যের দ্বারা সবকিছু ফাঁস হয়ে গেল। বিদ্রোহের সূত্রপাত ও বাতাবরণ তৈরি হয়েও প্রবল দমনপীড়নের ফলে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলো ব্রিটিশ প্রশাসন। ভারতে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝে, সহ-বিপ্লবীদের পরামর্শে দেশ ত্যাগ করে জাপানে পৌঁছালেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান যেতে পারেন এই খবর পেয়ে, তাঁর সচিব সেজে নাম নিলেন 'পি.এন. ঠাকুর'। জাপানেই পরিচয় হলো প্যান এশিয়ানিজমের নানান নেতার সঙ্গে। সেখানেও একসময় আত্মগোপন করে কাজ করতে হলো। অবশেষে জাপানি সহযোদ্ধাদের পরামর্শে জাপানি কন্যাকে বিবাহ করে নিতে হলো জাপানি নাগরিকত্ব। রেস্টুরেন্টের আড়ালে চলল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন বিপ্লবী কাজ। যোগাযোগ হতে লাগলো জাপানি সামরিক কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে, ভারতপন্থী রাজনীতিক ও প্রবুদ্ধজনের সঙ্গে। পরিকল্পনাকে তিলে তিলে রূপদান করে এভাবেই একদিন ডাক দিলেন ভারতবর্ষের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। জার্মানির হাতে বন্দি ভারতীয় সেনারা সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতাজী উপাধিতে ভূষিত করলেন।

১৯৪২ সালের ২৮-৩০ মার্চ টোকিয়োতে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ডাকে এবং সভাপতিত্বে জাপান, চীন, মালয় ও শ্যামদেশের বহু ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থির হয়, প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা স্থাপিত 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' নামে সরকারি দল এবং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একটি সেনাবাহিনী গঠিত হবে।

১৯৪২ সালের ২০-২৩ জুন, লিগের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় প্রবাসী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ব্যাংককে। এখানে জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, হংকং বর্মা, মালয়, শ্যামদেশ থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করলেন। উপস্থিত হলেন জাপান অধিকৃত ভারতীয় যুদ্ধবন্দি শিবিরের প্রতিনিধিরাও।

২২ জুন তৈরি হয়ে গেল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ। ঠিক হলো লিগের সশস্ত্র শাখা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর আধিপত্য থাকবে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল অব অ্যাকসন বা সমর পরিষদের উপর। পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন প্রথম সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু। অন্য সভ্যরা ছিলেন— এন. রাঘবন, কে.পি.কে. মেনন, ক্যাপ্টেন মোহন সিংহ ও কর্নেল জি.কিউ. গিলানি। ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার মাঝখানে লম্ফোদ্যত ব্যাঘ্রের ছবি সংকলিত পতাকা জাতীয় পতাকা হিসেবে গৃহীত হলো। ঠিক হলো, সুভাষচন্দ্র বসুকে বার্লিন থেকে এশিয়ায় আসার অনুরোধ করা হবে। এরপরেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে যে স্থানে ভারতীয়রা রয়েছেন, সেখানে লিগের বহু শাখা খোলা হলো। বহু সিভিলিয়ান লিগের সভ্য হলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য মোহন সিংহের নেতৃত্বে ভারতীয় বন্দি শিবির থেকে বহু ভারতীয় সেনাদলে যোগদান করলেন। তাদের সামরিক শিক্ষা শুরু হলো। পেনাঙে খোলা হলো 'স্বরাজ ইন্সটিটিউট' নামে একটি শিক্ষা শিবির। লিগের সদস্য যুবকেরা সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে গেলেন।

১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই, সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলের প্রকাশ্য সভায় রাসবিহারী বসু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষের হাতে তুলে দিলেন। ৫ জুলাই, সোনানের টাউন হলের সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হলো, সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন নেতাজী।

১৯৪৩, ২১ অক্টোবর, বেলা সাড়ে দশটায় ডাই তোয়া গেকিজোতে পূর্ব এশিয়ার সকল স্থানে কার্যকরী ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে অনুষ্ঠিত হলো সভা। প্রতিষ্ঠা হলো আজাদ হিন্দ সরকারের। বিদেশে প্রথম অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার। নেতাজী দেড় ঘণ্টার বক্তৃতার পর সর্বাধিনায়করূপে শপথ গ্রহণ করলেন, স্লোগান দিলেন 'দিল্লি চলো'। সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হলেন রাসবিহারী বসু।

আজাদ হিন্দ সরকারের পদাধিকারীরা :

সুভাষচন্দ্র বসু— রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী (মন্ত্রী : সমর ও বৈদেশিক বিভাগ) ও সেনা সর্বাধিনায়ক।

ক্যাপ্টেন ড. লক্ষ্মী স্বামীনাথন— মহিলা সংগঠন।

এস.এ. আয়ার— বেতার, সম্প্রচার ও প্রকাশনা।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ.সি. চ্যাটার্জী—অর্থ।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজ আহমদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এন.এস. ভগত, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডি.কে. ভোঁসলে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল গুলজারা সিংহ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম.জেড কিয়ানি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ.ডি. লোগাস্থন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইসান কাদের, লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহনওয়াজ খান।

এ.এন. সহায়— সেক্রেটারি।

অর্থাৎ বলা যায় স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রথম প্রধান উপদেষ্টা রাসবিহারী বসু। নেতাজীর মতো তিনিও বিশ্বের সকল ঘটনাকে বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করে, শত্রু-মিত্র জটিলতাকে সহজ সরল রূপ দিলেন, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধই যার অন্যতম চালিকাশক্তি। আত্মত্যাগ ছাড়া যে কোনো লড়াইয়ে শাশ্বত জয় সম্ভব নয়, তা তিনি ভারতবাসীকে, এমনকী বিশ্ববাসীকেও বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে যতদিন না তাঁর সংগ্রাম, প্রাণময়তা ও অভিজ্ঞতাকে আমরা মূলধন না করবো ততদিন আমরা যথার্থ দেশপ্রেমী হতে পারবো না।

১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি প্রয়াত হন এই মহাবিপ্লবী। মৃত্যুর আগে তাঁকে যথযোগ্য মর্যাদা দিয়ে জাপান সরকার 'সেকেন্ড অর্ডার অব দি মেরিট অব দি রাইজিং সান' অভিধায় সম্মানিত করে। ■

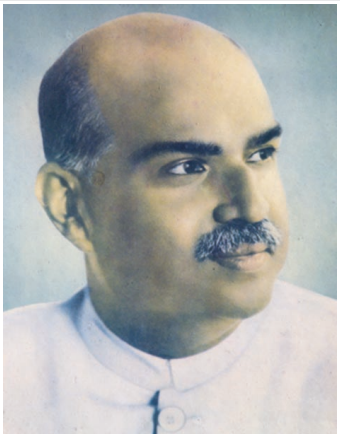

নজরুল ও শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্কের কথা আজকের প্রজন্ম জানে না

তথাগত রায়

বাঙ্গালি তথা বাকি ভারতবাসী ড. শ্যামাপ্রসাদের নাম প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কারণ আর কিছু নয়, কংগ্রেসি ও বামপন্থী চক্রান্ত। ২৪ জুন ১৯৫৩ সালে ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জি রোডের বাড়ি থেকে শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানের দিকে যখন যাত্রা করে তখন যে শবযাত্রা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল তার তুল্য শবযাত্রা, এমনকী শোভাযাত্রা কলকাতার রাস্তায় কমই দেখা গেছে। সম্ভবত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের শবযাত্রার সঙ্গে তুলনীয় ছিল। আমি যখন শ্যামাপ্রসাদের জীবনী লিখি তখন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর পুনের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তাঁর মরদেহের অপেক্ষায় উদ্বাস্তু এবং অন্যান্যরা তাঁর বাড়ির সামনে ট্রামরাস্তার উপরে সারারাত শুয়ে ছিল এবং মরদেহ দমদম বিমানবন্দর থেকে ভিড় ঠেলে ভবানীপুরের বাড়িতে যেতে সময় লেগেছিল সাত ঘণ্টা— যেখানে এক ঘণ্টার কম সময়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। এই বিষয়ে উৎসাহী পাঠক আমার লিখিত 'ভারতকেশরী যুগপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ' নামাঙ্কিত তাঁর জীবনীগ্রন্থটি (মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত, ২০১৮) পড়ে দেখতে পারেন।

> **পশ্চিমবঙ্গের এই দুই মনীষীর সম্পর্কের কথা আজকের প্রজন্ম প্রায় কিছুই জানে না। উলটে একটা বড়ো স্বার্থান্বেষী তথাকথিত সেকুলার মহল শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বলে প্রচার করে। এটা এক অর্থে বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য।**

এত যদি শ্যামাপ্রসাদের জনপ্রিয়তা ছিল তাহলে তাকে সবাই ভুলে গেল কী করে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, প্রধানত বামপন্থীদের প্রাণপণ চেষ্টা ও চক্রান্ত, যার পিছনে ছিল কংগ্রেসের নীরব ও উষ্ণ সমর্থন। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয় ২৩ জুন ১৯৫৩ সালে। এর মাত্র তিন সপ্তাহ পরে কমিউনিস্ট পার্টি একটি ট্রাম ধর্মঘট ডাকে— দাবি ছিল ট্রামের ভাড়া এক (পুরনো) পয়সা (৬৪ পয়সা সমান ১ টাকা) বাড়ানো হয়েছিল তা প্রত্যাহার করতে হবে। এই ধর্মঘটের জেরে তারা গোটা পনেরো ট্রাম পোড়ায়। বলা হয়, এই ধর্মঘট ও নাশকতার পিছনে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নীরব সমর্থন ছিল, কারণ লোকসভায় নেহরুকে চরম নাস্তানাবুদ করতেন শ্যামাপ্রসাদ। এই জন্যই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর ব্যাপারে নেহরু কোনো তদন্ত কমিশন বসাতে দেননি।

কিন্তু আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় শ্যামাপ্রসাদের পুরো জীবন নয়, তাঁর সঙ্গে কাজী নজরুলের সম্পর্ক। বাঙ্গালি কাজী নজরুল ইসলামের নাম এখনো মনে রেখেছে, তাঁর দুর্ভাগ্য শ্যামাপ্রসাদের মতো হয়নি। এমনকী বাড়াবাড়ি করে বামপন্থীরা তাঁকে এবং ইস্তাহার লেখক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বিশ্বকবির সঙ্গে একাসনে বসিয়ে 'রসুন-সন্ধ্যা' (রবীন্দ্র- সুকান্ত-নজরুল সন্ধ্যা) উদ্‌যাপন করত—যাক সে কথা। কিন্তু ড. শ্যামাপ্রসাদ কাজী নজরুলকে কতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন সেটার ব্যাপারে একটি ঘটনা নিবেদন করছি।

টাকাপয়সার ব্যাপারে নজরুল, যাকে চলতি বাংলায় বলে 'কাছাখোলা' সেইরকম মানুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা ও অন্যান্য খরচ মেটাবার জন্য তিনি প্রায় সাত হাজার টাকা ধার করে ফেলেছিলেন, যা সেই আমলের হিসাবে বিশাল অঙ্ক— তখন সাধারণ সিদ্ধ চাল ছিল দু-তিন টাকা মণ (১ মণ প্রায় ছত্রিশ কিলোর সমান)। শুধু তাই নয়, ধারটা করেছিলেন কাবুলিওয়ালার কাছে, যারা অসম্ভব সুদ নেয় এবং এর ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময়টা ১৯৪২ সালের প্রথমার্ধ। ঠিক এই সময় তিনি এক সুবর্ণ সুযোগ

পেয়ে গেলেন--- একটি বাংলা ছায়াছবির সংগীত পরিচালনার কাজ, যেটা করলে তাঁর আর্থিক সমস্যা মোটামুটি মিটে যেত যখন তিনি এই সুযোগ সাগ্রহে নিতে যাচ্ছেন, তখন ফজলুল হক অবিভক্ত বঙ্গের অগ্রগণ্য রাজনৈতিক নেতা--- নজরুলকে বললেন, তিনি খুব শিগগিরই তাঁর 'নবযুগ' পত্রিকাটি নতুন আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, যার জন্য তাঁর নজরুলকে প্রয়োজন। অতএব নজরুল যেন এখন ছায়াছবির কাজটা না নেন। হক সাহেবকে নজরুল তাঁর ঋণগ্রস্ত অবস্থার কথা জানাতে, হক সেটা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওসব ধারটার তিনি শোধ করে দেবেন। হক সাহেবের কথা ঠেলতে না পেরে নজরুল ছবির কাজটা ছেড়ে দিলেন। তারপর দিন যায়, হক সাহেব আর টাকাপয়সার ব্যাপারে কিছু বলেন না, এদিকে সুদ জমছে, নজরুলের প্রাণান্তকার অবস্থা।

একদিন নজরুল হক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, 'টাকাটা কবে পাব'? উত্তরে হক সাহেব বললেন, 'কোন টাকাটা?' নজরুলের পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে গেল। উপায়ান্তর না দেখে তিনি শ্যামাপ্রসাদের শরণাপন্ন হলেন। সে সময় বাঙ্গলার যে মন্ত্রীসভা অধিষ্ঠিত ছিল তার 'প্রধানমন্ত্রী' ছিলেন ফজলুল হক, আর অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ। মন্ত্রীসভার চালু নাম ছিল 'শামা-হক মন্ত্রীসভা'।

নিরুপায় নজরুল সাহায্য চেয়ে শ্যামাপ্রসাদকে চিঠি লিখলেন। চিঠি পেয়ে শ্যামাপ্রসাদকে তো নজরুলের ধার শোধের ব্যবস্থা করলেনই। সেই সঙ্গে নজরুলকে তাঁর অসুস্থ স্ত্রী সমেত নিজেদের মধুপুরের (ঝাড়খণ্ড) একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তখন গুরুতর অসুখবিসুখ হলে যখন ওষুধে কোনো উপকার হতো না, তখন যাঁরা পারতেন তাঁরা 'চেঞ্জ'-এ যেতেন। কলকাতার বাইরে কোথাও এই আশাতে যেতেন যে জল-হাওয়ার পরিবর্তনে তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠবেন। মধুপুরে থাকাকালীনই নজরুল শ্যামাপ্রসাদকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন সেটি হৃদয়স্পর্শী। তার থেকে একটু উদ্ধৃতি :

'শ্রীচরণেষু, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief and relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্তর আমার ব্যবস্থা না করলে কবি (মাইকেল) মধুসূদনের মতো হাসপাতালে আমার মৃত্যু হতো... আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব, সেদিন বাঙ্গালির আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে... আপনার মহত্ত্ব, আমার উপর আপনার ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা, শৌর্য, সাহস--- আমার অণু-পরমাণুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম-পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন। প্রণত— কাজী নজরুল ইসলাম।'

কিন্তু নজরুল নিজেই জানতেন না, এই সময় তিনি এক দুরারোগ্য স্নায়বিক রোগে ভুগছিলেন, যার ফলে তাঁর বাক্‌শক্তি ও স্মৃতিশক্তি ১৯৪৪ সাল নাগাদ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। ১৯৫২ সালে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তরা 'নজরুল ট্রিটমেন্ট সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন, যার পুরোভাগে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তাঁরা নজরুলকে লন্ডন ও ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সেই সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভিয়েনার অগ্রণী স্থান ছিল। কিন্তু লাভ হয়নি। নজরুল ওইভাবেই বেঁচে থাকেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাবার পরে ১৯৭২ সালে সেদেশের সরকার তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যায় এবং সেখানেই ১৯৭৬ সালে মারা যান।

পশ্চিমবঙ্গের এই দুই মনীষীর সম্পর্কের কথা আজকের প্রজন্ম প্রায় কিছুই জানে না। উলটে একটা বড়ো স্বার্থান্বেষী তথাকথিত সেকুলার মহল শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বলে প্রচার করে। এটা এক অর্থে বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য, কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা বিষয়গুলি মানুষের সামনে আনতে দেয়নি। ■

নেতাজীর সঙ্গে রাসবিহারী বসু।

রাসবিহারীকে সাত বছরের ওপর আত্মগোপন করে থাকতে হয় জাপানে। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে এই ৭ বছরে ১৭ বার বাড়ি পালটাতে হয়।

ছদ্মবেশ ধারণে অনন্য ছিলেন রাসবিহারী বসু

আঁখি মহাদানী মিশ্র

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হলেন রাসবিহারী বসু। গ্রামের পাঠশালায় এবং চন্দননগরে শিক্ষকদের কাছ থেকে শোনা বিভিন্ন গল্প ছিল তাঁর পরবর্তীকালের বিপ্লবী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা। স্কুলের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের বদলে দেশপ্রেমের কথা বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের কথা আছে এমনসব বই পড়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁর মনকে নাড়া দিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক লেখাগুলিও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত। রাসবিহারী বসু-সহ চন্দননগরের বহু তরুণ নিরালম্ব স্বামীর দ্বারা প্রচারিত সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন।

বৈপ্লবিক কাজকর্ম সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সম্পন্ন করার জন্য বহু বিপ্লবীকেই নিতে হয়েছে ছদ্মবেশ। তাই ছদ্মবেশ ধারণ বৈপ্লবিক কাজকর্মের একটি অঙ্গবিশেষ। এখানেও রাসবিহারী বসু অনন্য। তাঁর মতো ছদ্মবেশ ধারণকারী বিপ্লবী ভারতবর্ষের ইতিহাসে তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।

সর্দারজীর ছদ্মবেশে বসন্ত বিশ্বাসের হাত দিয়ে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা হামলার পর রাসবিহারী বসু দিল্লি থেকে দেরাদুনে চলে এসে একেবারে স্বাভাবিক ভাবে নিজের কাজ করতে থাকলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দা এই চক্রান্তের মাথা হিসাবে রাসবিহারী বসুকে চিহ্নিত করে। চলতে থাকে তাঁকে ধরার তোড়জোড়। এই খবর পেয়ে অতি সংগোপনে সরে পড়েন রাসবিহারী। শুরু হলো আত্মগোপন করে থাকার প্রথম অধ্যায়।

পুলিশের চোখ এড়াবার জন্যে চলে যান দুর্গম পাহাড়ি এলাকা কেলং। এখানে কয়েকমাস থেকে শেষে পৌঁছান কাশী। ১৯১৪ সালের বেশিরভাগ সময়টা কাটালেন কাশীর ডেরায় ডাঃ কালীপ্রসন্ন সান্যালের বাড়িতে। সেখান থেকেই বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা বোমার ক্যাপ খুলে পরীক্ষা করার সময় রাসবিহারীর হাতের একটি আঙ্গুল উড়ে যায়। ডাঃ সান্যাল তাঁকে অন্য বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। এই সময় একদিন ডাঃ সান্যাল বারাণসীর বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাটের দেওয়ালে রাসবিহারী বসুর ছবি-সহ বড়ো অক্ষরে পুরস্কারের কথা লেখা একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি সাঁটা দেখতে পান। সেকথা রাসবিহারীকে জানাতেই তিনি বুঝতে পারেন, আজ না হয় কাল পুলিশ তার খোঁজে এই বাড়িতে হাজির হবেই। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য তিনি এক অভিনব পন্থা বেছে নেন। হিন্দু মৃতদেহকে যেমনভাবে ঢাকা দেওয়া হয়ে থাকে সেই ভাবে রাসবিহারীকে আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার একটা খাটে শুইয়ে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটা পোড়ো বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এসব কাণ্ডের কিছুই পুলিশ টের পায়নি।

পুলিশকে বোকা বানানোর জন্য রাসবিহারীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এমন উদাহরণ অসংখ্য। একবার কলকাতার বাদুড়বাগানের মেসে রাসবিহারী বসু, তাঁর এক সঙ্গী নলিনী গুহ এবং আরও কয়েকজন যেখানে থাকতেন। সেখানে ঢাকা থেকে আনা একটা রিভলভার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার সময় ট্রিগারে হাত লেগে একটা গুলি ছুটে যায়। হাতে বেশ চোট লাগে। রাসবিহারী বুঝতে পারেন, গুলির শব্দ পুলিশের কানে যাবেই। হাতের চোট নিয়ে ছদ্মবেশে বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলির সাহায্যে বাদুড়বাগান থেকে প্রথমে আপার সার্কুলার রোডের একটা

বাড়িতে চলে যান। তারপর সুযোগ বুঝে পুলিশের নজর এড়িয়ে পৌঁছে যান চন্দননগরে। একবার তো পুলিশের হাতে ধরা পড়াটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। কোনো রকমে শুধু বুদ্ধি আর সাহসের জোরে, বেঁচে যান তিনি। একদিন সাতসকালে চন্দনগরের একটা বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ। চর মারফত জানতে পেরেছে, রাসবিহারী সেই বাড়িতে আছেন। সত্যি সত্যি তিনি সেই বাড়িতে তখন ছিলেন। যখন দেখলেন পুলিশ বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলেছে, তখন তিনি বাড়ির খাটা পায়খানায় থাকা বিষ্ঠা বোঝাই পাত্রটিকে মাথায় চাপিয়ে নির্বিকারচিত্তে মেথরের বেশে পুলিশের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান তাদের বোকা বানিয়ে।

সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অধিকাংশ ইংরেজ সৈন্য তখন ভারতের বাইরে তাদের নিজেদের দেশরক্ষায় ব্যস্ত। একজন অভিজ্ঞ বিপ্লবী হিসেবে রাসবিহারী বুঝলেন, এক মহাসুযোগ উপস্থিত। ভারতে রয়েছে তখন ৩০ হাজার সৈন্য, যার মধ্যে অধিকাংশই দেশীয়। এটা বুঝেই তিনি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঢাকা, এমনকী জব্বলপুরে থাকা সেনাছাউনিগুলিতে গোপনে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে ফেললেন। যোগাযোগ করা হলো বার্মা, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ-বাহিনীতে থাকা এদেশীয় সৈন্যদের সঙ্গে। স্থির হলো যে কলকাতায় জার্মানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র আসার পর ব্রিটিশবাহিনীতে দেশীয় সৈন্যদের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করা হবে। নির্দিষ্ট সংকেত পেলেই কয়েকজন বিপ্লবী বালোচ উপজাতিদের নিয়ে বালুচিস্তান সীমান্তে বিদ্রোহ ঘটাবে। পাশাপাশি রাসবিহারী বসু স্বয়ং লাহোরে থেকে, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বারাণসীতে, বিষ্ণুগণেশ পিংলে মিরাটে, কর্তার সিংহ সরাভা পাঞ্জাবে আর নলিনী মুখার্জি জব্বলপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাসবিহারী বসু অন্যান্যদের নিয়ে লাহোরে কিছুদিন থাকার জন্য আসেন। লাহোরবাসী রামশরণ দাসের ওপর ভার পড়ল একটা বাড়ি ভাড়া করার জন্যে। মুশকিল বাধল সেখানে, সরকারি আদেশ জারি হয়েছে যে, অবিবাহিত কাউকে বাড়ি ভাড়া দিতে হলে স্থানীয় থানায় জানাতে হবে। রাসবিহারী তো অবিবাহিত! থানায় জানানো মানে বাইরের বিপদকে ঘরে ডেকে আনা। সমস্যার সমাধান করলেন রামশরণের স্ত্রী রামরাখী। তিনি রাসবিহারীর স্ত্রী হিসেবে সাময়িকভাবে থাকতে রাজি হলেন।

রাসবিহারীর পরিকল্পনা মতো সেনাবিদ্রোহ কোনোভাবে ব্যর্থ হয়। পুলিশ জানতে পারে যে, এর পেছনে রয়েছেন রাসবিহারী বসু। ১৯১৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, প্রকাশ্য দিবালোকে উচ্চপদস্থ অফিসারের বেশে রাসবিহারী ট্রেনের সেই কামরায় উঠলেন যে কামরায় এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার চলেছেন তার নিজের কাজে। এভাবে পুলিশের চোখ ধুলো দিয়ে লাহোর ছেড়ে রাসবিহারী মাঝখানে নেমে পড়েন। তারপর ট্রেন বদল করে পাড়ি দেন বারাণসীর দিকে।

বারাণসীতে এসে রাসবিহারী বসু শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, গিরিজাবাবু-সহ পুরোনো সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। যা যা ঘটেছে তার সবকিছু খুলে বলেন তাদের কাছে। সেই সময় এটাও বলেন যে, পুলিশের হাতে ধরা পড়তে তার বোধহয় আর বেশি দেরি নেই। সংগঠনও অর্থসংকটে ভুগছে। এই অভাব দূর করার একটা উপায় আছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে জীবিত অথবা মৃত ধরার জন্যে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে পুরস্কারের জন্যে বরাদ্দ মোটা টাকাটা নিয়ে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করাটা একটা কাজের কাজ হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামকে চালু রাখার জন্য এ কাজ করলে রাসবিহারীর কী হবে তা সকলেরই জানা। সুতরাং সকলেই রাসবিহারীর এই প্রস্তাবকে সরাসরি খারিজ করে দিলেন। সকলেই একবাক্যে তাঁকে প্রস্তাব দেয় দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে যেতে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর রাসবিহারী দেশ ছাড়ার প্রস্তাব মেনে নেন।

শুরু হলো রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। স্থির করলেন জাপানে যাবেন। সেখান থেকে দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য নতুন পরিকল্পনা করবেন। তাঁর বিদেশে যাওয়ার দুটি উদ্দেশ্য ছিল। বিপ্লবীদের হাতে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবস্থা করা এবং বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অন্য দেশ থেকে আনার ব্যবস্থা করা। দেশ ছাড়ার কথাটা ভাবা যত সহজ, সেই ভাবনা অনুযায়ী কাজ করা অত সহজ ছিল না তখন। কারণ, দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে হলে পাসপোর্ট চাই। সেখানেই তো রাসবিহারীর ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বিপদে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো মানুষ তিনি নন। কাশী থেকে ঘুর পথে কলকাতায় আসেন। এখন কথা হলো পাসপোর্টের জন্য ছবি চাই। কীভাবে একটা পাসপোর্ট জোগাড় করা যায় তাই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন। সেই সময় একটা খবর বের হলো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিনের মধ্যে জাপানে যাবেন। খবরটা পড়েই রাসবিহারী উঠে পড়ে লাগলেন যে-কোনো ভাবে পাসপোর্ট পাওয়ার জন্যে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করতে তার জুড়ি নেই ভূভারতে। পাসপোর্টের জন্যে ছবি তোলাতে একটা মতলব খাটালেন। পি.এন. ঠাকুর নাম নিয়ে সেই পরিচয়ের মানানসই পোশাক পরে, মাথায় পাগড়ি চাপিয়ে ছবি তুললেন। সেই ছবি দিয়ে রাজা পি.এন. ঠাকুর নামে একটা পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করলেন। জাপান যাওয়ার কারণ হিসেবে পাসপোর্ট অফিসকে জানালেন যে তিনি সদ্য নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয়। তিনি জাপানে গিয়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব কর্মসূচির তদারকি করবেন। সরকারি দপ্তর নির্দ্বিধায় রাসবিহারীর এই যুক্তি মেনেও নেয়।

জাপানে হোটেলে থাকার সময় তিনি জানতে পারেন সেই হোটেলেই পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় এসেছেন। তিনি দেখা করেন মি.রায়ের সঙ্গে এবং একটি সভায় দু'জনেই ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি সামনে রেখে ইংরেজদের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করে উত্তেজক বক্তৃতা দেন। ফলস্বরূপ চর মারফত ইংরেজ দূতাবাস জানতে পারে পি.এন. ঠাকুর আর কেউ নন স্বয়ং রাসবিহারী বসু। এরপর খবর পেয়ে লালা লাজপত রায় চলে যান আমেরিকা। রাসবিহারী আত্মগোপন করেন জাপানেই। রাসবিহারীকে সাত বছরের ওপর আত্মগোপন করে থাকতে হয় জাপানে। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে এই ৭ বছরে ১৭ বার বাড়ি পালটাতে হয় তাঁকে। ৮ বছরের মাথায় তিনি এক জাপানি কন্যাকে বিয়ে করে জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য বহু বিপ্লবীর বহু আত্মত্যাগের উদাহরণ আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অগ্রদূত হিসেবে রাসবিহারী বসুও এর ব্যতিক্রম নন। ■

মাথাভাঙ্গায় উত্তরবঙ্গের বিদ্যামন্দির বিভাগের প্রাদেশিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের বিদ্যামন্দির বিভাগের প্রাদেশিক ক্রীড়ানুষ্ঠান গত ১১-১২ মে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা শহরের নেতাজী সুভাষ ক্রীড়াঙ্গনে সম্পন্ন হয়। ক্রীড়া শিবির ছিল মাথাভাঙ্গার সারদা বিদ্যামন্দির ভবন পরিসরে। ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জ মহকুমার সরকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নগেন্দ্রনাথ রায়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাথাভাঙ্গা বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার গাঙ্গুলি। ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে ছিলেন মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষকগণ। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সভাপতি জগন্নাথ দাস এবং সম্পাদক দেবাশিস লালা।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বিদ্যামন্দির বিভাগের ৯২ জন বোন এবং ১০৯জন ভাই-সহ মোট ২০১জন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন ৩৬জন আচার্য-আচার্যা। ফলাফলের নিরিখে ভাইদের মধ্যে সেরা বিদ্যালয় হেমতাবাদ সারদা বিদ্যামন্দির এবং বোনেদের মধ্যে সেরা বিদ্যালয় শিলিগুড়ি সেবক রোডের সারদা শিশুতীর্থ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারা আগামী আগস্ট মাসে বিদ্যাভারতী পূর্বক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের অন্যতম সদস্য তথা প্রান্ত খেলকুদ প্রমুখ বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ হরেন্দ্র চন্দ্র বর্মনের নেতৃত্বে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

প্রণবকন্যা সঙ্ঘের মাসিক পত্রিকা ‘গায়ত্রী-মাতা’র প্রকাশ অনুষ্ঠান

প্রণবকন্যা সঙ্ঘ প্রকাশিত পত্রিকার নাম গায়ত্রী-মাতা। হৃদয়পুরস্থিত প্রণবকন্যা সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রকাশ হয় । আগে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ছিল। কিছু সময় বন্ধও ছিল। গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে নব পর্যায়ে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। নতুন কলেবরে পত্রিকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী এবং প্রণবকন্যা সঙ্ঘের সভানেত্রী সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী মাতা। জ্ঞানানন্দময়ী মাতাজী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচক্রবর্তী অক্ষয় তৃতীয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আগামীদিনে পত্রিকার বিষয়বস্তু কীরূপ হওয়া উচিত, সেবিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ দান করেন। বর্তমান সংখ্যাটিতে প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীচক্রবর্তী, লিখেছেন স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ, ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মপুত্র শাণ্ডিল্য, রামব্রহ্ম দেবশর্মা, স্বাগতা বিশ্বাস ও বন্দনা সেন। পত্রিকাটির মূল্য কুড়ি টাকা। বার্ষিক গ্রাহক হয়ে এবং আর্থিক অনুদান প্রদান করে পত্রিকার চলার পথ সুগম করতে অনুরোধ করেছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ।

সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে সুরদাস জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১২ মে সন্ত সুরদাসের জন্মজয়ন্তীতে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা শাখা কলকাতাস্থিত মানিকতলার কল্যাণ ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের রাজ্য সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম, পূর্বতন সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়,স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সহ সভাপতি প্রয়াত সত্যনারায়ণ আগরওয়ালের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সম্পাদক অনিখ ব্যানার্জি এবং অন্যান্য কার্যকর্তা।

শ্রীচক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, সন্ত সুরদাস ছিলেন জন্মান্ধ। অন্তরের দৃষ্টি থাকলে একজন অন্ধও যে অভূতপূর্ব সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারেন, সন্ত সুরদাসের জীবনচরিত পাঠ করলে নিজেকে বিশেষভাবে সক্ষম করে তুলতে পারবেন যে কোনো দিব্যাঙ্গ।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী পারমিতা কুণ্ডু এবং ড. সুজাতা রায় মান্না। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডাঃ সাত্যকি দাস।

তমলুকে আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ

গত ২৭ এপ্রিল আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে সঙ্ঘের তমলুক জেলা কার্যালয়ে আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৩ জন মহিলা, ১৫ জন পুরুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সুস্থ জীবনশৈলী, বনৌষধি, ঘরোয়া উপাচার, সনাতনী সংস্কার ও বিজ্ঞান বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা

পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনে স্কোপ কলকাতা এবং বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (ICCR)-র সত্যজিৎ রায় সভাকক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'বঙ্গজীবনে রাম— শশাঙ্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ।' অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আলোচক হিসেবে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দর্শন ও সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক ড. রাকেশ দাস, বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ সংগীতের বিশিষ্ট শিল্পী ও সংগীত গুরু জগন্নাথ দাশগুপ্ত এবং গৌড়ীয় নৃত্য পুনরাবিষ্কারিকা অধ্যাপিকা মহুয়া মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সেরা লেখকদের সম্মান জানানো হয়।

গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের পূজিতাদেবী গন্ধেশ্বরী

কল্যাণ গৌতম

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণের একটি হলো গন্ধেশ্বরী পূজা। তিনি সুগন্ধ বহনকারী দেবী। তাঁকে শক্তিরই একরূপ মনে করা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মূলত গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মানুষরাই এই পূজা করে থাকেন। গন্ধবণিকরা এদিন দেবীর পূজা করে তাঁদের ব্যবসায়িক সামগ্রী, হিসাবের খাতা, ওজনযন্ত্র প্রভৃতি পূজা করে নিজেদের ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি কামনা করেন।

চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন বঙ্গদেশে একটি সমাজের কথা জানতে পারেন, যা তিনি তাঁর গ্রন্থে 'গন্ধবণিক নামে' উল্লেখ করেছিলেন।

গন্ধবণিক সমাজ মূলত সেই সময়ে সুগন্ধি মশলা, ধূপ-ধুনা ইত্যাদির ব্যবসা করতেন। গন্ধবণিক সমাজ প্রথমে ছিল শৈব, পরে শাক্ত এবং তারও পরে বৈষ্ণব হয়। তারা গন্ধদ্রব্যের ব্যবসা করে থাকেন। এই গন্ধবণিক সমাজের পূজিতাদেবী হলেন মা গন্ধেশ্বরী।

গন্ধেশ্বরী দেবী শক্তির প্রতীক। মা দুর্গার সঙ্গে তাঁর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই সিংহবাহিনী এবং অসুরমর্দিনী। শক্তির এক রূপ হলেন মা দুর্গা। মা দুর্গার অনেক রূপের মধ্যে একটি হলেন মা গন্ধেশ্বরী। গন্ধেশ্বরী নামকরণের দুটি দিক রয়েছে— (১) সুগন্ধি দ্রব্যের বাণিজ্য করতেন যারা তাদের পণ্যর নাম অনুসারে দেবী গন্ধেশ্বরী। (২) গন্ধকে বলা হয় পঞ্চভূতের ক্ষিতিতত্ত্বের সমষ্টিগত রূপ বা পৃথিবী।

গন্ধেশ্বরী মাতা হলেন মা দুর্গারই চতুর্ভুজা রূপ। গন্ধমাতা ও পৃথিবীমাতা একই। তিনি ব্যোম তত্ত্বে শুধুই শব্দ। মরুৎতত্ত্বে তিনি শব্দ ও স্পর্শের মিলিত রূপ। তেজ তত্ত্বে তিনি শব্দ, স্পর্শ ও রূপের সমষ্টি এবং অপঃ তত্ত্বে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসের সমষ্টি। ক্ষিতিতত্ত্বে এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গন্ধ। অর্থাৎ পঞ্চভূতের পূজা করাই হলো মা গন্ধেশ্বরীর পূজা।

পৃথিবীতে বণিক সমাজ এই পঞ্চভূতের পণ্যরূপ নিয়ে বাণিজ্য করেন। বাণিজ্য করার সময় ভুলবশত যদি কোনো পাপকর্ম করে ফেলা হয়, তবে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় গন্ধেশ্বরী পূজা করার ফলে। গন্ধবণিক সমাজে বহু সেবামূলক কর্মযজ্ঞ আছে।

গন্ধেশ্বরী দেবী সিংহবাহিনী, ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা, শঙ্খ-চক্র, ধনুক-বাণ ধারিণী। বৌদ্ধ বণিকরাও গন্ধেশ্বরীদেবীর পূজা করেন। এককালে বঙ্গীয় বণিকদের নানা শাখায় বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে গন্ধেশ্বরী পূজা হতো। পূর্ববঙ্গের পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে মা গন্ধেশ্বরীরও একটি মূর্তি রয়েছে। তবে সেটি প্রাচীন মূর্তি নয়।

মা দুর্গাই গন্ধেশ্বরী। ইনি ধনসম্পদ রক্ষা করেন। লক্ষ্মীরূপে ধন দান করেন। তিনি ধন দান করেন তিনি রক্ষাও করেন। মা গন্ধেশ্বরী বণিকদের ধনের রক্ষাকর্ত্রী।

মহানন্দীশ্বর পুরাণ ও ভবপুরাণে গন্ধেশ্বরী দেবীর উল্লেখ রয়েছে। ভবপুরাণের কাহিনিটি এইরূপ ঃ গন্ধাসুর নামে এক অসুর দেবীর রূপ লাবণ্যের কথা শুনে মোহিত হয় এবং তাকে বিয়ে করার আশায় শিবের কঠোর তপস্যা করে। তপস্যায় শিব প্রসন্ন হয়ে তার অভিলাষিত বর দান করেন। অসুর তখন শিবের রূপ ধারণ করে দাক্ষায়ণীকে প্রার্থনা করে। দেবী অসুরের দুরাশা ও কপটতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রাণ সংহার করে অসুরের শরীর গন্ধমাদন পর্বতে রূপান্তরিত করে ফেলেন। সেই পর্বত থেকে তখন নানা গন্ধদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। তখন দেবগণ দেবীকে পূজা করে গন্ধেশ্বরী নাম প্রদান করেন।

কাজী নজরুল রচিত শ্যামা সংগীত রৌদ্রী রূপের প্রকাশ

তিলক সেনগুপ্ত

কৃষ্ণনগরে অর্থকষ্ট ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপের জন্যে নজরুল ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমদিকে তিনি ১১নং ওয়েলেসলি স্ট্রিটের 'সওগাত' অফিসের একতলার ঘরে এসে ওঠেন। তারপর তিনি সেখান থেকে উঠে যান এন্টালি অঞ্চলের পান বাগান লেনের একটি বাড়িতে। কিছুদিন সেখানে থাকার পর উত্তর কলকাতার কয়েক জায়গায় বাসা বদল করে শেষে তিনি মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের একটি ছোটো বাড়িতে সংসার পাতেন। এই বাড়িতে ১৩৩৭ সালে (১৯৩০) ২৪শে বৈশাখ তার ৪ বছরের শিশুপুত্র বুলবুল বসন্ত রোগে মারা যায়। নজরুল তখন বিধ্বস্ত। নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হয়ে অধ্যাত্ম রাজ্যে শান্তির সন্ধানে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা মহেশ নারায়ণ অ্যাকাডেমির হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদারের শরণাপন্ন হলেন। বরদাচরণবাবু ছিলেন গৃহী যোগী। যোগ সাধনায় লব্ধ তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অলৌকিক শক্তি ছিল বিস্ময়কর।

লালগোলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়ার পর বরদাচরণ নলিনীকান্ত সরকারের গ্রাম নিমতিতা হাইস্কুলে প্রথমে সহকারী ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি যখন নিমতিতায় ছিলেন তখন নজরুল একবার একটি বিয়ের বরযাত্রী হয়ে সেখানে যান এবং বরদাচরণকে দেখার সুযোগ পান। ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সুবিধা না হলেও পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। তাই পুত্র-শোকাতুর নজরুল বরদাচরণের কাছে ছুটে যান এবং তাঁর সংস্পর্শে মানসিক শান্তি লাভের ফলে তার উদ্দাম ও বিশৃঙ্খল জীবনে সুসংহত স্থিতি দেখা যায়। নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থভুক্ত 'যোগী বরদাচরণ' প্রবন্ধে এই ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

কথিত, বরদাচরণের যোগশক্তির প্রভাবে নজরুল তাঁর মৃতপুত্র বুলবুলকে একবার স্থূলদেহে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। যোগী বরদাচরণই নজরুলকে পরবর্তীতে অধ্যাত্মমুখী করে তুলে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নজরুলের জীবনে তাঁর একটি বিশেষ স্থান অনস্বীকার্য। বরদাচরণের কাছে অধ্যাত্ম-উন্নতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে নজরুল ধর্ম সাধনায় একাগ্রচিত্ত হন। পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদ প্রভৃতি সম্পর্কে অনুশীলন চলতে থাকে। তিনি গেরুয়া বসন পড়তে আরম্ভ করেন। এই সময়ে রচিত তার সাধন সংগীতগুলি গভীর আত্মসাধনার স্বাক্ষর বহন করে। অধ্যাত্মসাধনকালে তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার এক নতুন দিগন্ত দেখা দেয়। বহু বিস্মৃতপ্রায় রাগ-রাগিনীকে উদ্ধার করে সেই সব সুরে তিনি গান রচনা করেন। এই সময় নজরুল নির্ঝরিণী, রেনুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতি, বনকুন্তলা ও দোলনচম্পা নামে কয়েকটি নতুন রাগিনী সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় সমগ্র বিশ্ব যখন অস্থির, তখন ভারতে দানা বাঁধছে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। ঠিক সেইসময় 'শাক্তদর্শন' থেকে প্রভাবিত হয়ে নজরুলের শ্যামাসংগীত রচনা শুরু হয়। বসন্ত রোগে পুত্র বুলবুলের অকালমৃত্যুর পর যে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাঁর জীবনে, সেই শূন্যতাই কবিকে কালীসাধনার দিকে ঠেলে দেয়। নজরুলের লেখা শ্যামাসংগীতগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আবেগের গভীরতা এবং অমোঘ জীবনদর্শনের মিশেল। তিনি লিখেছিলেন, 'ভক্তি, আমার ধূপের মত/ঊর্ধ্বে উঠে অবিরত।'

আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবমত উদ্ভবের পাশাপাশি শাক্তমতের উদ্ভব ঘটে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন কালোত্তীর্ণ, জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক, সাম্যবাদী ভাবনায় অনুপ্রানিত, জাতীয় সংকটকালে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার অভয় মন্ত্রদায়ী, সাধক কবি।

শাক্তদর্শনকে উপজীব্য করে শাক্তগীতি চর্চার একটি নতুন ধারা প্রচলিত হয়। শ্যামাসংগীতের ধারাটি বিকাশ লাভ করে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। আষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন এতে প্রাণসঞ্চার করেন। তাঁর মাধ্যমেই বাংলা গানে শাক্ত পদাবলী বা শ্যামাসংগীত নামে একটি বিশেষ সংগীতধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রশ্নাতীতভাবে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শ্যামাসংগীতকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

জীবদ্দশায় গজল, ভক্তিগীতি, কাব্যগীতি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার গান রচনা করেছিলেন নজরুল। নজরুলগীতিগুলির অধিকাংশের সুর তাঁর নিজেরই। তাঁর রচিত ভক্তিগীতির সংখ্যা প্রায় ১২০০। তার মধ্যে প্রায় ২৪৭টি শ্যামাসংগীত সমৃদ্ধ করেছে ভক্তিগীতির ইতিহাসকে। ১৯৬৬ সালে নির্বাচিত একশোটি শ্যামাসংগীতে সমৃদ্ধ 'রাঙাজবা' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। তিন টাকা মূল্যের এই বইয়ে নজরুলের শামাসংগীত সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়। ভক্তহৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা ও আর্তি ধরা পড়ে এইসব গানের মধ্যে।

স্বাভাবিকভাবেই শ্যামাসংগীতের প্রভাব নজরুলের কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে। ১৯২২ সালে ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য কবির এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেই কবিতায় উপজীব্য বিষয় ছিল 'শাক্তসাধনার প্রকাশ'—

'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?'

ভক্তি-সংগীত পর্যায়ের নজরুল রচনার একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে শ্যামাসংগীত। শক্তিদেবী কালী বা শ্যামার মাহাত্ম্য বর্ণনা এই গানের বিষয়বস্তু। বাংলা কাব্য সংগীতের ধারায় শ্যামাসংগীতের ঐতিহ্য বেশ দীর্ঘ এবং দীর্ঘ সংগীত রচনাক্রমে যে ক'জন উল্লেখযোগ্য রচয়িতার আবির্ভাব ঘটেছে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম। পৌরাণিক ভয়ংকরী কালীকে তিনি রূপায়িত করেছিলেন স্নেহবৎসলা মাতৃরূপে। তাঁর সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় গৃহস্থঘরের মা-ছেলের সম্পর্কের মতো। পদ বৈভব ও সুরগৌরবের সম্মিলনে নজরুলের শ্যামাসংগীত উৎকর্ষের এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে যে বর্তমানকালের কারও রচনার সঙ্গে এর তুলনা মেলে না। শ্যামাসংগীত রচয়িতা রূপে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বা দাশরথি রায় সাংগীতিক নান্দনিকতার যে উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন, কাজী নজরুল ইসলামও সেই স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কবি ও সুরস্রষ্টারূপে নজরুল পরবর্তী শ্যামাসংগীত রচয়িতাদের অপেক্ষায় মহত্তর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সেই পরিচয় তিনি অনেক শ্যামাসংগীতে অত্যন্ত গভীরভাবে রেখেছেন। বাংলা কাব্য সংগীতের ধারায় যেসব শ্যামাসংগীত কালোত্তীর্ণ গৌরব লাভ করেছে তাদের মধ্যে নজরুল রচিত গান সংখ্যায় যথেষ্ট। বল রে জবা বল, মহাকালের কোলে এসে, আয় নেচে আয়, আয় এ বুকে, আমার মানসবনে ফুটেছে রে, শ্যামা নামের লাগলো আগুন, মাতৃ নামের হোমের শিখা, ওমা তোর চরণ কি ফুল দিলে, রাঙা জবায় কাজ কি মা প্রভৃতি নজরুল রচিত শ্যামাসংগীত স্থায়ী সংগীত-গৌরব অর্জন করেছে। মুখ্যত নজরুল ইসলাম, রামপ্রসাদ সেন প্রবর্তিত মাতৃভাবময় শ্যামা সংগীত রচনার ধারাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এর বাইরে তিনি কয়েকটি শ্যামাসংগীত রচনা করেন সেগুলোকে আমরা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

একশ্রেণীর গানে আছে কালীর রৌদ্রী-রূপের আশ্চর্য বর্ণনা, আরেক শ্রেণীর গানে ধ্বনিত হয়েছে দেশাত্মবোধের চেতনা। 'অনেক মানিক আছে শ্যামা আজ না হয় কালই তোরে', 'আদরিনী মোর শ্যামা', 'আমার অহংকারের মূল', 'আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়', 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে' প্রভৃতি নজরুল রচিত মাতৃভাবময় শ্যামাসংগীতের অন্তর্গত।

কয়েকটি শ্যামাসংগীতে নজরুল মা-কালীর রৌদ্রীরূপের বর্ণনা করেছেন— 'মহা শক্তিময়ী রণরঙ্গিনী', 'অসুরনাশিনী', 'নৃমুণ্ডমালিনী' এইসব গানে দিগ্‌বসনা মা কালীর চরাচর স্তম্ভিত করা রৌদ্রীরূপের আশ্চর্য বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন কবি নজরুল। শ্যামাসংগীতে এক নতুন ব্যঞ্জনা এইসব রচনায় বিধৃত হয়েছে। শ্যামার রৌদ্রী রূপের বর্ণনামূলক গানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হলো 'মাতল গগন-অঙ্গনে ওই আমার রণ-রঙ্গিনী মা'। চিরজাগরণের কবি, শিকলভাঙার কবি, কালজয়ী স্রষ্টা কাজী নজরুলের কয়েকটি শ্যামাসংগীতের ভিতর দিয়ে দেশাত্মবোধের প্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে সমান ভাবে। জনজাগরণের কামনা এসব গানের ভেতর দিয়ে স্পষ্টতই অনুভূত হয়—

'জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা আবার রণচণ্ডী সাজে
তুই যদি না জাগিস মাগো ছেলেরা তোর জাগবে না যে
অন্নদা তোর ছেলে-মেয়ে অন্নহারা ফেরে ধেয়ে,
বাঁচার অধিক আছে মরে, দেখে কি প্রাণে না বাজে
শ্মশান ভালোবাসি যে তুই ভূ-ভারত আজ হলো শ্মশান,
এই শ্মশানে আয় মা নেচে, কঙ্কালে তুই জাগা মা প্রাণ।

চাই মা আলো মুক্ত বায়ু, প্রাণ চাই চাই পরমায়ু,
মোহ-নিদ্রা ত্যাগ কর মা শিব, জাগা তুই শবের মাঝে।।'

'নিপীড়িত পৃথিবী ডাকে' এই গানটিতেও উদ্দীপনা মূলক দ্যোতনা প্রতিফলিত হয়েছে।

তাঁর দুর্বার কলম লিখে চলে 'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়।' কখনও মা কালী ভিন্নরূপে ধরা দিচ্ছেন তাঁর ভাবনায়। দেবীর কৃষ্ণরূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে লিখছেন, 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।' আবার কখনও ঝরে পড়ছে আক্ষেপ, 'বল রে জবা বল, কোন সাধনায় পেলি শ্যামামায়ের চরণতল।' শুধু মাতৃরূপে নয়, কন্যারূপেও নজরুল মা কালীর বন্দনা করেছেন, 'আদরিণী মোর শ্যামা মেয়ে রে/কেমনে কোথায় রাখি। রাখিলে চোখে বাজে ব্যথা বুকে/ (তারে) বুকে রাখিলে দুখে ঝুরে আঁখি।'

বৈচিত্র্যের পথ ধরে নজরুলের শ্যামাগানে তান্ত্রিক ভাবধারা প্রকাশিত হয়— 'শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ
ধূপ-কাঠিতে/যত জ্বলি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে।' নজরুলের শ্যামাসংগীতগুলির সুরগত বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কানে ও মনে
শ্যামাসংগীতের একটি সুরগত নকশা বা ঢং বাসা বেঁধে আছে অথচ নজরুলের শ্যামাসংগীতে সুরে সেই বিশেষ ঢং নেই। এগুলিতে রাগ ও সংগীত এবং মার্গ সংগীতের প্রভাব প্রবল। প্রবল বলেই প্রথম রেকর্ড করার সময় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খোল না বাজিয়ে বাজানো হয়েছিল পাখোয়াজ। অবশ্য খাঁটি শ্যামাসংগীতের ঢঙে নজরুল যে সংগীত রচনা করেননি এমনও নয়।

শ্যামাসংগীতে নজরুলের স্থান অনেকরই উপরে বলা যায়। 'বলরে জবা বল কোন সাধনায় পেলি রে তুই শ্যামামায়ের চরণতল', 'মা তোর কালো রূপের মাঝে রসের সাগর লুকিয়ে আছে', 'শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে', 'আমি বেল পাতা দেব না মা গো দেবো শুধু আঁখির জল', 'আমি মা বলে যত ডেকেছি সে ডাক নূপুর হচ্ছে ও রাঙা পায়', 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'আর লুকাবি কোথায় মা কালী' ইত্যাদি গান শ্যামাসংগীতের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নজরুলের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

তিনি সাধনা করেছেন শক্তির। শক্তিপূজায় তার ভক্ত হৃদয়ের আকুলতা ও আরতি সেসব গানের মধ্যে দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে উৎসর্গ করেছেন মাতৃচরণে। তাঁর এই শ্যামাসংগীতের সম্ভার জনপ্রিয় করে তোলেন মৃণাল কান্তি ঘোষ, শৈল দেবী, কৃষ্ণদাস ঘোষ প্রমুখ কিংবদন্তী শিল্পী।

কাজী অনিরুদ্ধ লিখছেন, 'বুলবুলের মৃত্যু' অতঃপর আমার মাতৃদেবীর স্বাস্থ্য হানি— এই দুটি পারিবারিক ব্যাপার আমার পিতৃদেবকে অস্থির ও পাগলপ্রায় করে তুলেছিল। তিনি শান্তি খুঁজছিলেন। যাঁরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁরাই জানেন পিতৃদেবের এই সময়কার মানসিক অবস্থার কথা। যোগাসনে বসে তিনি যোগাভ্যাস করতেন, প্রায়ই যেতেন দক্ষিণেশ্বরে, আমরাও যেতুম সঙ্গে কখনো কখনো। বাড়িতে অনেক সময় কাটাতেন আমার মাতামহী গিরিবালা দেবীর ঠাকুর ঘরে। একবার আমরা তখন শ্যামবাজার স্ট্রিটে থাকি। একদিন গ্রীষ্মকালের এক সন্ধ্যায় কাউকে কিছু না জানিয়ে পিতৃদেব ভাবের ঘোরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন।'

১৩৭৫ সাল। 'দেবস্তুতি' নামে নজরুল যে রচনাটি তৈরি করলেন তার গানের স্বরলিপিকার নিতাই ঘটক। এর মধ্যে আছে নজরুলের তিনটি অপ্রকাশিত রচনা ও ১৬টি গান। নিতাই ঘটক সে বইয়ের নিবেদনে লিখেছেন, '১৯৩৮ সালে জানুয়ারি মাসে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে কবি দেবস্তুতি লেখেন। সেই রচনার কিছুদিন আগে থেকেই কবি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ গভীরভাবে মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করে সেই সময় তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে জ্ঞানীগুণী সাধুসন্তদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তাঁকে এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার যোগসাধনা করতেও দেখেছি।

সেই সময় তিনি, আমিষ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তাঁর বিধবা শাশুড়ির সঙ্গে দিনে ও রাত্রে মাত্র একবার সাত্ত্বিক মতে আহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে
কবির নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকতা দেখে আমরা তখন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।'

নজরুল সম্পর্কে গোঁড়া মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগের কারণ ছিল নজরুলের শ্যামাসংগীত রচনা। একজন মুসলমান হয়ে কীভাবে তিনি হিন্দুদেবী মা কালীকে নিয়ে গান লিখতে পারেন, তা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। কিন্তু নজরুলের কলম থামানো যায়নি।

মুসলমানের ছেলে মা কালীকে নিয়ে গান লিখবে, গানে গানে শ্যামা মায়ের চরণ বন্দনা করবে— তা গোঁড়া হিন্দু-মুসলমান কেউই মানতে পারেননি। শোনা যায় একসময় বাংলাদেশ বেতারে নিষিদ্ধ হয়েছিল নজরুলের শ্যামাসংগীত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রক্ষণশীলদের আক্রমণের ব্যাপারে নজরুল বলেছেন, 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কোনওটাই নয়। আমি শুধু হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে নিয়ে হ্যান্ডশেক করানোর চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে। হিন্দুধর্মের প্রতি অগাধ আগ্রহ ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কারণে মুসলমানদের একটা অংশ নজরুলকে বয়কট করেছিল। এমনকী আক্রমণকারীরা তাঁকে 'কাফের' অভিধায় ভূষিত করতে ছাড়েনি। 'বিদ্রোহী' নজরুলও দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি তাঁর কৈফিয়তে লেখেন,

''মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্লারা ক'ন হাত নেড়ে,
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!"

এককথায়, কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন কালোত্তীর্ণ, জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক, সাম্যবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত, জাতীয় সংকটকালে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার অভয় মন্ত্রদায়ী, সাধক কবি। □

পশ্চিমি মিডিয়ায় হিন্দুফোবিয়া

ভারতের বুকে ক্রিয়াশীল মোদী বিরোধী দলগুলি, লেফট্-লিবারাল ইকোসিস্টেমের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পশ্চিমি মিডিয়ার একটা বড়ো অংশ বা ভারতের শত্রুরা ভারতে ক্ষমতার শীর্ষে একটি দুর্বল সরকার এবং একজন মেরুদণ্ডহীন, ভীরু নেতাকে দেখতে চায়। ঠিক যেভাবে তারা দীর্ঘদিন কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রীদের দেখেছে।

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে গত ১৯ এপ্রিল ভারতে শুরু হয়েছে সাধারণ নির্বাচন। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে যা হলো গণতন্ত্রের মহোৎসব। কিন্তু এই নির্বাচন চলাকালীন পশ্চিমি মিডিয়াগুলি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হিন্দু বিরোধী প্রচারে নেমে পড়েছে। ভারতের নির্বাচনী সংবাদগুলিকে এই বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলি মোদী বিরোধী রটনার মোড়কে পরিবেশন করছে। তৈরি করছে 'হিন্দু-আতঙ্কবাদ'-এর মিথ্যে ন্যারেটিভ। বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা নরেন্দ্র মোদীর জয় অনিবার্য এবং সেই কারণে ভারতে গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘুরা (মূলত মুসলমানরা) বিপন্ন। অনবরত চলতে থাকা এই অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা। ব্যাপকতর আকারে চলতে থাকা এই মিথ্যে প্রচারের কারণে ভারতীয় ও প্রবাসী ভারতীয়রা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের জনসাধারণও বিভ্রান্ত হতে পারেন। দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের জানতে হবে যে আন্তর্জাতিক স্তরে কীভাবে ভারত বিরোধী শক্তি এই কাজে লিপ্ত এবং তথাকথিত নামি সংবাদ সংস্থাগুলি তাদের তল্পিবাহকের কাজ করে চলেছে।

সম্প্রতি একটি সংবাদের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি নিউজের শিরোনাম ছিল— 'ভারতে ৬ সপ্তাহব্যাপী নির্বাচন শুরু হয়েছে, হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হতে পারেন'। সিবিএস নিউজ রিপোর্টে প্রকাশ— 'ভারতের ২০২৪ সালের নির্বাচন শুরু হয়েছে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের উপর এর বড়ো প্রভাব পড়বে'। France 24-এর শিরোনাম অনুযায়ী— 'ছয় সপ্তাহের নির্বাচনে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী মোদীই জনপ্রিয়'। অন্যদিকে রয়টার্স জানিয়েছে— 'ভারতের ভোটে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হিন্দুদের পবিত্র ভূমিতে মসজিদ'। এই প্রতিবেদনে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত বিতর্কিত কাঠামোর পক্ষে সওয়াল করেছে রয়টার্স।

নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের দ্বিতীয় মেয়াদকে নিশানা করে নিউ ইয়র্ক টাইমস্ তাদের একটি প্রতিবেদনে লিখেছে যে রামমন্দির ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিংসতার পরিচয়বাহী একটি স্মৃতিসৌধ। ভারতকে 'ক্লস্ট্রোফোবিক' হিন্দু জাতিতে পরিণত করছেন হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা মোদী। তাঁর গত গত ৫ বছরের কার্যকালকে কাঁটাছেড়া করে তারা লিখেছে যে ভারত এখন এক গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে তাদের দাবি হলো যে মোদী তাঁর দেশকে 'হিন্দুত্ববাদ'-এর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের নিবন্ধে ব্যবহৃত চিত্রে দেখানো হয়েছে যে তিলক কেটে মোদীজী মাথায় মুকুট পড়ে তির-ধনুক বহন করছেন। পিছনে একটি তলোয়ারও দেখা যাচ্ছে। এসবের মাধ্যমে তারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে যে তাঁর তৃতীয় মেয়াদে মোদী আরও বেশি প্রশাসনিক ক্ষমতা জাহির করবেন।

নিউ ইয়র্ক টাইমসে এই হিন্দু বিরোধী প্রোপাগান্ডাধর্মী নিবন্ধটির লেখক হলেন— সিদ্ধার্থ দেব। 'হিন্দু আতঙ্কবাদ'-এর মিথ্যে ন্যারেটিভ নির্মাণের চেনা ছকে একজন গড়পড়তা মোদী-বিদ্বেষীর লেখা এই নিবন্ধটিতে 'হিন্দু জঙ্গি' জনতা অবৈধ ভাবে অযোধ্যায় একটি মসজিদ ভেঙে দিয়েছে বলে বর্ণনা করে রীতিমত শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সুচতুরভাবে লেখক উল্লেখ করেননি যে হিন্দুপক্ষ সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইয়ে জয়যুক্ত হওয়ার পরে তাঁর জন্মস্থানে ভগবান রামলালার ভব্য মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা গণতন্ত্রের মুখোশ পড়ে আছে এই অভিযোগে হিন্দুদের অভিযুক্ত করে লেখক এই নিবন্ধে লিখেছেন যে থিয়োক্র্যাটিক স্টেটের পরিচয়বাহী বৈশিষ্ট্যগুলি হিন্দুরা এড়িয়ে গেলেও ভারত কার্যত একটি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ২০০৭ সালে আদালতে কংগ্রেসি সরকারের দেওয়া হলফনামার প্রতিফলন ঘটিয়ে সিদ্ধার্থ দেবের দাবি হলো ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অস্তিত্বের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। নতুন সংসদ ভবনকে কেন্দ্র করেও মোদী সরকারকে তিরবিদ্ধ করেছেন এই লেখক। তার মতে পুরনো সংসদ ভবনটি ভারতের 'বহুমুখী' ইতিহাসকে তুলে ধরলেও নবনির্মিত এই সংসদ ভবন 'একমুখী' ইতিহাসের প্রতিফলন।

মোদীজীর নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ২০১৯ সালের বিজেপির সংকল্পপত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল এবং সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) বলবৎ করার বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পাশাপাশি এই নিবন্ধে লেখা হয়েছে যে এরপর ভারতীয় মুসলমানদের নাগরিকত্ব বিপন্ন করে

ফঃ ৫

এনআরসি চালু করা হবে। মোদীজী ক্ষমতা দখল করলে তাঁর সরকারের তরফে এইসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হবে বলে বিভ্রান্তিকর দাবি করা হয়েছে এই নিবন্ধে। এমনকী ভারত বিরোধী এই নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদগোষ্ঠী এই ভোটে ইভিএমে কারচুপির মিথ্যে প্রচারও শুরু করেছে। ইভিএম ও ভিভিপ্যাট হ্যাকিং বা ট্যাম্পারিঙের তত্ত্ব অ্যান্ডি মুখার্জিদের মতো ভারত বিরোধী কলমচিদের নিউ ইয়র্ক টাইমসের মাধ্যমে একটি মিথ্যে প্রচার। ভারতের শীর্ষ আদালত মিথ্যা ও অসদুদ্দেশ্যপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়ে ইভিএম হ্যাকিঙের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ রূপে খারিজ করেছে।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ছড়াতে এবং বিশ্বব্যাপী ভারতের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে আল জাজিরার মতো সংবাদমাধ্যম ভারতের সংখ্যালঘুরা বিপদের সম্মুখীন বলে জঘন্য প্রচারে শামিল হয়েছে। ভারতের মুসলমানরা 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' ও 'স্বৈরাচারী' শাসন ও নিপীড়নের শিকার বলে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে কাতারের মালিকানাধীন প্রোপাগান্ডা নিউজ আউটলেট আল জাজিরা। তথ্য বিকৃতির জন্য কুখ্যাত এই মিডিয়া দাবি করেছে যে নরেন্দ্র মোদীর সরকারের মেয়াদবৃদ্ধি মুসলমানদের জীবনযাত্রাকে বিপদের মুখে ফেলতে পারে। আল জাজিরার তরফে প্রকাশিত ভিডিয়ো প্রতিবেদনের শিরোনাম হলো— 'সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে ভারতের মুসলমানরা কী অনুভব করে?'এই ভিডিয়োতে দাবি করা হয়েছে যে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় আসার পর থেকে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলির দাবি আবাসন, ধর্ম ও কর্মসংস্থানে মুসলমানদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই ভিডিয়োতে বেশ কয়েক জন মুসলমানকে বলতে দেখা গিয়েছে যে মুসলমানরা ভারতে পুরোপুরি অবহেলিত আর মোদীর শাসনের এই দশ বছরে তারা আরও অবহেলার শিকার হয়েছে। যেখানে বাস্তব ঘটনা হলো ভারতে মুসলমানরা সবচেয়ে ভালো আছে, বরং হিন্দুরা এখানে নানাভাবে জেহাদের শিকার। বিগত কংগ্রেস সরকারগুলো ভয়াবহ হিন্দুবিরোধী আইন জারি করেছে। বিগত দিনের সরকারগুলি নির্লজ্জ ভাবে মুসলমান তোষণ করে গিয়েছে। আল জাজিরা এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় নির্বাচনের মেরুকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের তরফে প্রোপাগান্ডা-ধর্মী এই মিথ্যে নিউজের কভারেজ রীতিমতো উসকানিমূলক। ভারতীয় মুসলমানদের উস্কে দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি জমিতে বিশেষ ধর্মের লোকজনের দখলদারির পরোক্ষ উল্লেখ করে তাদের তৈরি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার জন্য কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থার বিষয়টিও এই নিউজের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই ধরনের অবৈধ দখলদারদের মুসলমান পরিচয়ের কারণে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে বলে এই নিউজে দাবি করা হয়েছে। নিউজে আরও দাবি করা হয়েছে যে কোনো নোটিশ না দিয়েই কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলছে। ভিডিয়োটিতে মহম্মদ গুলাব শেখ নামক এক মাংসের দোকানের মালিককে বলতে শোনা যায় যে বিজেপি সরকার নবরাত্রির সময় মাংসের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে, তবে উত্তরপ্রদেশের পূর্ববর্তী অ-বিজেপি সরকারগুলির আমলে এমনটা ছিল না। শেখের দাবি হলো এই ধরনের সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হলো মুসলমানরা। বাস্তব হলো উত্তরপ্রদেশ সরকার নবরাত্রি উৎসব চলাকালীন মুসলমানদের বা কারও মাংসের দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি।

আল জাজিরার এই ফেক ভিডিয়োর বিপ্রতীপে মোদীজীর শাসনকালে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় নানান কেন্দ্রীয় স্কিম ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধালাভ করেছে। সংখ্যালঘু উন্নয়নের লক্ষ্যে মোদীজীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রয়েছে। ঐতিহ্যগত শিল্প বা কারুশিল্পের উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, হুনার হাট, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গরিব নওয়াজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই স্কিম ও কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে কেন্দ্র। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে ভারত সরকার কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যের সুযোগ রাখেনি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হোক বা টয়লেট, জলের সংযোগ বা রান্নার জ্বালানি, বন্ধকহীন ঋণদান বা 'আয়ুষ্মান ভারত' স্বাস্থ্য বিমা— কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রণীত কোনো প্রকল্পের বাস্তবায়নে ধর্মকে মানদণ্ড হিসেবে ধরেনি। সুতরাং, নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত সরকারের তরফে মুসলমানদের প্রতি কোনো বৈষম্য যে হয়নি তা প্রমাণিত।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অবৈধ নির্মাণ ধ্বংসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে কোনো ধর্মকে মাপকাঠি ধরা হয়নি। আল জাজিরার চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনো সরকার সরকারি মালিকানাধীন জমি বা খাস জমিতে বা কোনো রাস্তা দখল করে মুসলমানদের কোনো অবৈধ মাজার, মসজিদ বা অন্য কোনো ধর্মীয় কাঠামো তৈরি করতে দিলে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, সেটা হবে ধর্মীয় তুষ্টিকরণ বা এক কথায় তোষণ।

আল জাজিরা দেখিয়েছে যে ২০১৯ সালে সরকারে মুসলমানদের ৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব থাকলেও এখন তা শূন্য শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। কাতারের মালিকানাধীন এই প্রোপাগান্ডা আউটলেটের এই দাবির প্রেক্ষিতে তুলে ধরা যায় এক সহজ সত্য। যে কোনো রাজনৈতিক দলের মতো, বিজেপিও একটি নির্বাচনী এলাকায় তাদের কোনো প্রার্থীর জেতার ক্ষমতাকে তার ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করে। প্রার্থী মনোয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা এবং তাঁর জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টিই বিজেপির কাছে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। তাই ধর্মের সঙ্গে বিজেপির প্রার্থী মনোনয়ন বা জনতার দ্বারা বিজেপি চয়নিত সেই প্রার্থীদের নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই।

দ্য গার্ডিয়ানের মতো পত্রিকাও তাদের আস্তিন গুটিয়ে রেখেছে। বিজেপি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টায় হিন্দুদের অপমান করা এবং মুসলমানদের নির্যাতিত সংখ্যালঘু হিসেবে উপস্থাপন করাটাই ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানের ভারতীয় লোকসভা নির্বাচনের কভারেজের লেইট-মোটিভ (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রচারের মধ্যে একই ন্যারেটিভের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পুনরাবৃত্তি)। দ্য গার্ডিয়ানে প্রকাশিত হানা এলিস পিটারসেন রচিত নিবন্ধের শিরোনাম— 'ভারতে শুরু হওয়া নির্বাচনে মোদী তৃতীয়বার জয়ী হবেন বলে ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত'। এই নিবন্ধে বলা হয়েছে যে মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার গণতন্ত্রকে 'ক্ষুণ্ণ' করা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসেন নরেন্দ্র মোদী। মোদীজীর ক্ষমতায় ফিরে আসা

নিয়ে দ্য গার্ডিয়ানের এই ভীতিপ্রদ স্বর থেকে বোঝা যায় যে লেখিকা অনেকাংশে নিশ্চিত যে প্রধানমন্ত্রী মোদী তৃতীয়বার জয়ী হবেন এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার আরেকটি পূর্ণ মেয়াদ প্রাপ্তি সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু তিনি এখনও এমন অলৌকিক কিছু ঘটার ব্যাপারে আশাবাদী যা 'ভারতের গণতন্ত্র বাঁচাতে' পারে! ভারতের বিরোধী দলগুলির উত্থাপিত অভিযোগগুলিকে তোতাপাখির মতো আউড়ে দ্য গার্ডিয়ানের এই নিবন্ধে বলা হয়েছে যে রাজনৈতিক বিরোধীদের জেলে পোরার জন্য মোদী সরকার পরিকল্পিতভাবে শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করছে। ব্রিটিশ প্রোপাগান্ডা আউটলেটটি এই ক্ষেত্রে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কারাবাসের কথা উল্লেখ করেছে। তবে তারা এটা উল্লেখ করেনি যে দিল্লির মদ কেলেঙ্কারির মামলায় কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তার গ্রেপ্তারি বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্ট আপ সুপ্রিমোকে বেশ কয়েক বার জামিন দিতে অসম্মত হয়। সম্প্রতি দিল্লিতে সংঘটিত লোকসভা নির্বাচনে আপ প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাকে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সিদ্ধার্থ দেবের কায়দায় পিটারসেনও তার লেখায় অযোধ্যার রামমন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন। কীভাবে এই মন্দিরটি ইতিমধ্যেই একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তাও তার লেখায় উঠে এসেছে। দ্য গার্ডিয়ান প্রকাশিত এই নিবন্ধে আয়কর বিভাগের তরফে কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। পিটারসেনের দাবি মোদী সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করেছে। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস দলের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে অনিয়ম সামনে আসার পর আয়কর বিভাগের তরফে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস হিন্দু জাতীয়তাবাদকে 'ফ্রিঞ্জ মতাদর্শ' (অর্থাৎ সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, অপ্রাসঙ্গিক চিন্তাধারা) বলে অভিহিত করেছে। একই সঙ্গে তারা বলেছে যে মোদীজীর শাসনের এই এক দশকে এটি মূলধারায় পরিণত হয়েছে। এই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস হলো একটি আমেরিকান নিউজ এজেন্সি— ইসলামপন্থী, জেহাদিদের অপরাধকে ঢাকতে বা লঘু করে

ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করা থেকে শুরু করে ভারতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা গবেষণায় জোর, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারতের মতো প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন সশক্ত ভারত নির্মাণ এবং বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রণী ভূমিকার বিষয়গুলি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরছেন, তখন হতাশাগ্রস্ত, পক্ষপাতদুষ্ট বিদেশি মিডিয়া মোদীজীকে কেবলমাত্র একজন 'হিন্দু কট্টরপন্থী' হিসেবে উপস্থাপনে তৎপর হয়েছে।

দেখাতে যারা সিদ্ধহস্ত। যার সাংবাদিকরা হামাস সন্ত্রাসবাদীদের আশকারা দেওয়ার জন্য কুখ্যাত। এমনকী এদের হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ফ্রিঞ্জ মতাদর্শ বলে দাগিয়ে দেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী একদা তাদের তরফে আখ্যায়িত এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী ফ্রিঞ্জ মতাদর্শ প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসনের অধীন বর্তমানে ভারতে মূলধারায় পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর তরফে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ লালনপালনের এই ন্যারেটিভ তৈরির পাশাপাশি, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রকাশিত কৃত্তিকা পথি ও শেখ সালিকের এই প্রতিবেদনটিতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমি মিডিয়ার বিষ উগড়ে দেওয়া দেখার মতো। এই নিবন্ধে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসনকালে হেট স্পিচ (ঘৃণা ভাষণ) থেকে শুরু করে লিঞ্চিং পর্যন্ত নানা ভাবে সংখ্যালঘুদের (মূলত মুসলমানদের) উপর আক্রমণ হয়েছে। যদিও পশ্চিমি মিডিয়া বেছে বেছে লিঞ্চিঙের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে রিপোর্টিঙের জন্য নির্বাচন করে। সেই ঘটনাগুলি তারা রিপোর্টিঙের জন্য পরিকল্পনামাফিক বেছে নেয় যেখানে ভুক্তভোগী একজন মুসলিম এবং আক্রমণকারী একজন হিন্দু। এইভাবে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে তারা একটি রূপরেখার তৈরিতে সচেষ্ট থাকে যে ভারতের হিন্দুদের 'সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন' চলছে এবং হিন্দুত্ববাদের সমর্থকরা মুসলমানদের টার্গেট করছে। কিন্তু ইসলামপন্থী জেহাদিরা যখন কানহাইয়ালাল বা উমেশ কোলহেকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে, তখন এই পশ্চিমি মিডিয়া গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় অথবা জেহাদের এই খবরগুলিকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেয়। ভারতের বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিছক একজন 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' নেতা বলে নরেন্দ্র মোদীকে দাগিয়ে দিয়ে বিদেশি মিডিয়াগুলির এই অপকর্ম অব্যাহত। ভারতের লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদেশি মিডিয়ার তথাকথিত কভারেজের মাধ্যমে চালু থাকা এই অপপ্রচারের মূল বিষয় হলো হিন্দু জাতীয়তাবাদ, বিভাজনমূলক রাজনীতি। এই অপপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতে সংখ্যালঘু নিপীড়ন, ভারতে রাজনৈতিক বিরোধী ও মিডিয়ার কণ্ঠকে দমন চলছে— এইরকম মিথ্যে ন্যারেটিভ নির্মাণ। ভারতের বুকে ক্রিয়াশীল মোদী বিরোধী দলগুলি, লেফট্-লিবারাল ইকোসিস্টেমের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পশ্চিমি মিডিয়ার একটা বড়ো অংশ বা ভারতের শত্রুরা ভারতে ক্ষমতার শীর্ষে একটি দুর্বল সরকার এবং একজন মেরুদণ্ডহীন, ভীরু নেতাকে দেখতে চায়। ঠিক যেভাবে তারা দীর্ঘদিন কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রীদের দেখেছে। ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করা থেকে শুরু করে ভারতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা গবেষণায় জোর, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারতের মতো প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন সশক্ত ভারত নির্মাণ এবং বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রণী ভূমিকার বিষয়গুলি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরছেন, তখন হতাশাগ্রস্ত, পক্ষপাতদুষ্ট বিদেশি মিডিয়া মোদীজীকে কেবলমাত্র একজন 'হিন্দু কট্টরপন্থী' হিসেবে উপস্থাপনে তৎপর হয়েছে।

রবীন্দ্র শ্রদ্ধার্ঘ্যে রামগান ও রামায়ণ কাহিনি

কালমৃগয়া

প্রবীর ভট্টাচার্য ।। একেবারে কিশোরবেলায় যৌবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ভানু সিংহ ছদ্মনামে ব্রজবুলি অনুকরণে লিখেছিলেন ভানুসিংহের পদাবলী। কবি জয়দেব ও কবি বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভা তাঁকে সবসময় প্রভাবিত করেছে। রাধা-কৃষ্ণের লাস্যভাবে প্রভাবিত হয়ে এই পদাবলী রচনা। বাল্যকালেই তাঁকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল শ্রীরামচন্দ্র ও রামায়ণ। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যকর্মে বারে বারে ফিরে এসেছে রামায়ণের নানা উপাখ্যান বা শ্রীরাম চরিত্র। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে (১৮৮১ খ্রিঃ) বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি রচনা করেন জীবনের প্রথম নাট্যসাহিত্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'। কৃত্তিবাসী রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি পশ্চিমি সুরে এই গীতিনাট্য রচনা ও অভিনয় করেন।

ঠিক তার পরের বছর রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি রামায়ণে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেন 'কালমৃগয়া'। মৃগয়ায় এসে হরিণ ভেবে ভুলবশত মহারাজা দশরথের তিরে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্ধমুনির পুত্র। পুত্রের বিয়োগব্যথায় অন্ধমুনি প্রাণত্যাগ করার আগে মহারাজা দশরথকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, এভাবেই পুত্রশোকে তাঁরও প্রাণ যাবে। রামায়ণের এই ঘটনা সকলের জানা। সদ্য বিলেত থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্য রচনায় পশ্চিমি সংগীতের সুরকে ব্যবহার করেছিলেন নিজস্ব ঢঙে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ এবং স্কোপ কলকাতার যৌথ উদ্যোগে পঁচিশে বৈশাখের সন্ধ্যায় কলকাতার আইসিসিআর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সত্যজিৎ রায় সভামঞ্চে বসেছিল আলোচনা সভা 'বঙ্গজীবনে রাম— শশাঙ্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ'। আলোচনা সভা শেষে নিবেদিত হয় নৃত্যনাট্য কালমৃগয়া।

বিশিষ্ট গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পারফর্মিং আর্টসের অধ্যাপক ড. সৌম্য ভৌমিকের পরিচালনায় নৃত্যনাট্যের মূল আকর্ষণ ছিল সংগীত। অয়ন মুখোপাধ্যায় ও শুভদীপ চক্রবর্তীর সংগীত পরিচালনায় প্রায় এক ঘণ্টার এই নৃত্যনাট্যকে টান টান করে রেখেছিল অপূর্ব সুরের মূর্ছনা এবং অবশ্যই বলতে হয় পোশাকের অভিনব ভাবনা। পুরানো দিনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বনদেবীদের একটু খাটো পোশাক এবং তাতে আলপনার কাজ, মাথায় শোলার মুকুট, নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনা — সবকিছুতেই বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাব ফুটে উঠেছিল। চল্লিশজন শিল্পী সমন্বয়ে নৃত্যনাট্য টান টান থেকেছে নৃত্য পরিকল্পনার সৌকর্যে।

নৃত্যনাট্য শুরু হচ্ছে আঠারোজন ঋষিকুমারকে নিয়ে অন্ধমুনির আশ্রমিক শিক্ষাদান। এরই মাঝে বনদেবীদের আগমন এবং মহারাজা দশরথের মৃগয়া একটি আদর্শ আরণ্যক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই সময়েই পিপাসার্ত পিতা-মাতার জন্য জল আনতে গিয়ে হরিণ ভেবে মহারাজা দশরথের শব্দভেদী বাণে বিদ্ধ হন মুনিকুমার। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে মহারাজা দশরথ অন্ধমুনির মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে মুনিবরের কাছে উপস্থিত এবং অন্ধমুনির পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ— এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি করে। যন্ত্রসংগীতের মূর্ছনা ও নৃত্যবিন্যাস এই পর্বটিকে নিখুঁতভাবে ফুঠিয়ে তোলে।

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতি যে অপরিসীম অনুরাগ তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ছোটো ছোটো নৃত্য মুহূর্ত সৃষ্টি করে দর্শকদের মোহিত করে দিয়েছেন পরিচালক সৌম্য ভৌমিক। অরণ্যে পশুপাখির উপস্থিতি এবং মৃগয়ায় পশু শিকার পর্যন্ত অপূর্ব দক্ষতায় দেখানো হয়েছে। প্রতিটি চরিত্র যথাযথ। তবে আলোর প্রয়োগ ঠিকমতো হয়নি। মঞ্চজুড়ে বনদেবীদের নৃত্যে আলোর স্বল্পতা খানিকটা হলেও রসসঞ্চারে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু রবীন্দ্র শ্রদ্ধার্ঘ্যে ব্যতিক্রমী এই নিবেদন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছিল— এটা হলফ করে বলা যায়। □

বিশেষ সক্ষমতাকে অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন অরিজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বালি শিক্ষা নিকেতন বালক বিভাগ স্কুলের কলা বিভাগের ছাত্র অরিজিৎ বসু। বাড়ি বালির ফকিরচন্দ্র পাঠক লেনের একটি ছোটো ফ্ল্যাটে। এই বছর তিনি ছিলেন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। জন্মগত সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত অরিজিৎ। উঠে দাঁড়ানো, হাঁটা-চলার ক্ষমতাহীন অরিজিৎ হুইল চেয়ারকে সঙ্গী করেই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর জীবনের লড়াই। গত ৮ মে প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০০-র মধ্যে ৪৩৩ নম্বর পেয়েছেন অরিজিৎ। যদিও ৯০ শতাংশ নম্বর পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন অরিজিৎ। বিশেষ শারীরিক সক্ষমতা জয়ী অরিজিতের সাফল্যের উৎস হলো অদম্য অধ্যবসায় এবং প্রগাঢ় ইচ্ছাশক্তি। অরিজিতের সাফল্যে আনন্দিত তাঁর স্কুল শিক্ষক ও সহপাঠীরা জানিয়েছেন যে অরিজিৎ তাঁদের গর্ব। সত্যজিৎ রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাস্কিন বন্ডের সাহিত্যের অনুরাগী অরিজিৎ। তবে আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে ইংরেজি গল্পের বই কিনতে না পারলেও স্কুলের গ্রন্থাগার থেকে বই এনে পড়তেন অরিজিৎ।

২০১৬ সালে তাঁর বাবা প্রয়াত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর অরিজিতের মা মিলি বসু বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে জামাকাপড় বিক্রি করে সন্তান প্রতিপালন ও জীবন নির্বাহ করছেন। কীভাবে পুত্রের কলেজের খরচ জোগাড় করবেন সেই কথা ভেবে তিনি চিন্তিত। প্রতিদিন ফিজিয়োথেরাপি করতে হয় অরিজিৎকে। বিশেষ ভাবে সক্ষম হলেও দমে যাওয়ার পাত্র নন এই তরুণ। উচ্চ মাধ্যমিকে ইংরেজিতে পেয়েছেন ৯৪। আগামীদিনে ইংরেজিতে অনার্স-সহ উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখেন অরিজিৎ। উচ্চ মাধ্যমিকে তাঁর চয়নিত বিষয় ছিল— বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন। স্কুলে পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আলাদা সময় বরাদ্দ করে তাঁকে পড়া বুঝিয়ে দিতেন। একজন গৃহশিক্ষকের কাছে বাংলা ও ইতিহাস পড়েছেন অরিজিৎ। উচ্চ মাধ্যমিকে সাফল্য পেলেও স্কুল জীবন তাঁর শেষ। তাঁর জন্য প্রতি বছর একতলায় হতো ক্লাস। স্কুলের মাস্টারমশাইরাই বাড়ি থেকে স্কুল যাওয়ার টোটো ঠিক করে দিয়েছিলেন। বন্ধুরাও প্রয়োজনে কোলে করে তাঁকে স্কুলের দোতলায় নিয়ে যেত।

প্রতিভাবান ও মেধাবী এই ছাত্রটিকে অভিনন্দন এবং তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সুব্রত গোস্বামী বলেন, স্কুলের আগামীদিনের পড়ুয়াদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে অরিজিৎ। স্কুলজীবন অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করা অরিজিৎ গত ১০ মে উচ্চ মাধ্যমিকের মার্কশিট হাতে পেয়ে সত্যিই আবেগমথিত। স্কুলজীবন শেষ এই কথা ভেবে চোখে জল চলে আসে তাঁর। মানব জীবনের সব প্রতিকূলতা এবং বিশেষ শারীরিক সক্ষমতাকে যে জয় করা যায়, সব বাধা অতিক্রম করে অর্জন করা যায় যে সাফল্য— তাঁর উদাহরণ হলেন বালির এই সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ছাত্র অরিজিৎ বসু। তাঁর জীবনকে অনুসরণ করে নিশ্চিতভাবেই পড়াশোনার প্রেরণা পাবে আগামীদিনের ছাত্রসমাজ। □

ইতিহাসের কথা

বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ

রানি লক্ষ্মীবাঈ ভারত-ইতিহাসে ‘ঝাঁসির রানি’ নামেই সুপরিচিত। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্না এক বীরাঙ্গনা ছিলেন।

ভারতে বিদেশি শাসনকে আপ্রাণ শক্তিতে প্রতিহত করার উদ্যম ও সাহস তাঁকে এক আদর্শ বীর নারীর প্রতীক রূপে ইতিহাসে স্থান করে দিয়েছে। তিনি ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ভাগীরথীবাঈ সংস্কৃতিসম্পন্না, ধর্মভীরু, বুদ্ধিমতী ও দয়াবতী মহিলা ছিলেন। বাবা মোরোপন্থ ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি।

বাল্যকালে লক্ষ্মীবাঈয়ের নাম ছিল মণিকর্ণিকা। ডাক নাম মনু। মনুর চারবছর বয়সেই মাতৃবিয়োগ হয়। বাবা-ই তাকে মানুষ করেন। মনু পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো এবং তলোয়ার যুদ্ধে পটু হয়ে ওঠে।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ঝাঁসির মহারাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে মনুর বিয়ে হয়। ঝাঁসির বিখ্যাত গণেশ মন্দিরে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। তখন তাঁর নাম হয় লক্ষ্মীবাঈ। প্রজারা তাঁকে ভালোবেসে ঝাঁসির রানি নামে ডাকতো।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এক পুত্র জন্মায়। দুর্ভাগ্যবশত শিশুটি চারমাস বয়সেই মারা যায়। এরপর তাঁরা দামোদর রাও নামে এক বালককে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তার কিছুদিন পরেই মহারাজা পরলোকগমন করেন। রানি তখন সবে অষ্টাদশ বর্ষীয়া। তবু তিনি সাহস হারাননি এবং রাজকর্তব্যও বিস্মৃত হননি।

বড়লাট ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ আইনের বলে ঝাঁসি অধিকার করার দুরভিপ্রায়ে ঘোষণা করলেন, ঝাঁসির সিংহাসনে কোনো উত্তরাধিকারী নেই। দত্তকপুত্র দামোদর রাওকে তারা উত্তরাধিকারী স্বীকার করেন না। তারা ঘোষণা করল, রানিকে বার্ষিক ষাটহাজার টাকা রাজন্যভাতা দেওয়া হবে এবং তার বিনিময়ে রানিকে ঝাঁসির অধিকার ত্যাগ করতে হবে।

রানি লক্ষ্মীবাঈ রণনীতি হিসেবে সাময়িকভাবে এই অপমান হজম করলেন, সেটা ছিল বিস্ফোরণের আগে নীরব আগ্নেয়গিরির মতোই। আত্মসম্মান ও দেশপ্রেমের প্রতীক রানি সংকল্প করলেন, ঝাঁসি কিছুতেই শত্রুর করতলগত হতে দেওয়া চলবে না। তিনি ঘোষণা করলেন— মেরী ঝাঁসি নহী দুঙ্গী ।

ইংরেজদের মোকাবিলা করার জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের সবাইকে নিয়ে সৈন্যদল গঠন করলেন। মেয়েরাও সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন। তাঁর সাহসী যোদ্ধাদের সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত প্রজা তাদের প্রিয় রানির আদর্শের জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ঝাঁসি আক্রমণ করে। ঝাঁসির যোদ্ধারা দুই সপ্তাহ মরণপণ যুদ্ধ করেন। নারী সেনারা যুদ্ধের পাশাপাশি সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব এবং আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার পালন করেন। রানি ঘোড়ায় চড়ে পুরুষের বেশে যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১৮৫৮ সালে ১৯ জুন মাত্র ২৩ বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বলিদান করেন।

রূপশ্রী দত্ত

নদ-নদী পরিচয়

অজয় নদ

বিহারের জামুই জেলার ৩০০ মিটার উঁচু পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করে দেওঘরের পাশ দিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনের কাছে শিমজুড়িতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। তারপর পশ্চিম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়াঘাট, বীরকুলটিঘাট, দরবারডাঙ্গাঘাট ও সিদ্ধপুরঘাট হয়ে বীরভূম জেলার বড়কোলা, তামড়া, বিনুই ও নবসন গ্রামের পাশ দিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার নারেং গ্রামে প্রবেশ করে কাটোয়া শহরের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কবি জয়দেব, কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মস্থান অজয় নদের তীরে।

এসো সংস্কৃত শিখি– ২৪

ভবত্যা:–আপনার (স্ত্রীলিঙ্গ)। কস্যা: ? – কার?
ভবত্যা: দ্রোণী। আপনার বালতি।
ভবত্যা: চমস:। আপনার চামচ।
অভ্যাস করি–
কস্যা: বস্ত্রম্ ? ভবত্যা: বস্ত্রম্ ।
কস্যা: চলবাণী ? ভবত্যা: চলবাণী।
কস্যা: পুত্র ? ভবত্যা: পুত্র:।
কস্যা: শাটিকা ? ভবত্যা: শাটিকা।
কস্যা: মস্তকম্ ? ভবত্যা: মস্তকম্ ।
কস্যা: দ্বিচক্রিকা ? ভবত্যা: দ্বিচক্রিকা
প্রয়োগ করি—
ভবত্যা: দিয়ে বাক্য বলা অভ্যাস করুন (২০টি)
কেবলং স্ত্রীলিঙ্গে ভবত্যা: ভবতি।

ভালো কথা

দাদুর বন্ধুরা

গত শীতে একদিন সকালে আমার দাদু বাইরে চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। এমন সময় চারটি হনুমান কোথা থেকে এসে দাদুর পাশে বসল। তার মধ্যে একটি হনুমান দাদুর পা ধরে কী যেন চাইছিল। আমরা ভাই-বোনেরা প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপরে অবাক হলাম যে দাদু হনুমানটির মাথায় হাত রেখে বললেন, থামো, তোমাদের জন্য কলা আনছি। দাদু ঘর থেকে কলা এনে তিনটি হনুমানকে দুটি করে কলা দিলেন। একটি হনুমান গাছে উঠে বসে ছিল। ওটি লাফ দিয়ে দাদুর হাত থেকে সব কলা নিয়ে আবার গাছে উঠে বসল। দাদু হাসতে লাগলেন, আমরাও খুব মজা পেলাম। আমি দাদুকে বললাম তোমার ভয় লাগছিল না? দাদু বললেন, ভয় কেন লাগবে, ওরা তো আমার বন্ধু।

শ্রেষ্ঠা দত্ত, অষ্টমশ্রেণী, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মা

মৌমিতা দেবনাথ, দশম শ্রেণী, নিমতা, কলকাতা-৪৯

মা শব্দটি বলতে ছোটো
শুনতে ভারী মিষ্টি
মা শব্দটি লিখতে সোজা
মা যে সকল সৃষ্টি।
মা মানেই আবেগ আবেশ
অনুভূতির এক নাম
মা মানেই দশভুজা
সুরক্ষার আরেক নাম।
মা মানেই দিনের শেষে
ঘরে ফেরার টান
তাইতো আজ সকল মাকে
কোটি কোটি প্রণাম।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

সাধুসন্তদের আক্রমণ, অপমান, অসম্মান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৮ মে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে গোঘাটের একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে বাম জমানায় গোঘাটে সিপিএমের সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ওই সময় সিপিএমের হাতে আক্রান্তদের সাহায্যার্থে কামারপুকুরের রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করে নজিরবিহীনভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধুসন্তদের সমালোচনা ও তীব্র আক্রমণ করতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন, 'সব সাধু সমান হয় না। সব স্বজন সমান হয় না। আমাদের মধ্যেও কি আমরা সবাই সমান? এই যে বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন। আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে— কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার তালিকায় তারা দীর্ঘদিন ধরে আছে। কিন্তু যে লোকটা বলে, তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট বসতে দেব না, সেই লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ, সে ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করছে'। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাধুসন্তরা রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতিত্ব করছেন এই অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি আইডেন্টিফাই করেছি কে কে করেছেন। আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন রয়েছে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি! সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, আপনাদের অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, তখন কিন্তু আমি পুরো সমর্থন দিয়েছিলাম। মা-বোনেরা আসত। তারা তরকারি কেটে দিত। সিপিএম কিন্তু আপনাদের কাজ করতে দিত না'।

সাধুসন্তদের 'দিল্লির আজ্ঞাবহ' আখ্যা দিয়ে তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী অভিযোগ করেন, 'দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে। বলে, বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধুসন্তেরা এই কাজ? রামকৃষ্ণ মিশনকে সবাই সম্মান করে। ওদের কাছে একটা হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপ রয়েছে। ওদের যারা মেম্বার হয়, দীক্ষা নেয়, তারা আছে। তাদের আমি ভালোবাসতে পারি। আমি দীক্ষা নিতে পারি। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনো দিনও। এটা আমি জানি। তাহলে আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলব? মমতা আরও বলেন যে, 'কেউ কেউ ভায়োলেট (লঙ্ঘন) করছে। সবাই নয়। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িটাই থাকত না, আপনাদের এই মেয়েটা যদি না থাকত'। এরপরেই মমতা বলেন যে কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটে মাফিয়াদের হাত থেকে তিনি কীভাবে রক্ষা করেছিলেন! মায়াপুরে ইসকনকে জমি তিনি বরাদ্দ করেন বলেও দাবি করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নাম করে মমতার এই জঘন্য আক্রমণের পালটা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ইমামেরা আবেদন করতে পারেন, রাজ্যের শাসক দলের হয়ে ভোটভিক্ষা করতে পারেন আর কার্তিক মহারাজ (স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী) প্রতিবাদ করলে অসুবিধা? বিজেপির কোনো মঞ্চে তাঁরা ছিলেন না। তাঁরা এখানে (পশ্চিমবঙ্গে) হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করেন।' এর পাশাপাশি শুভেন্দুবাবু মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষমূলক, হিংসাত্মক মন্তব্যের প্রসঙ্গ টানেন। প্রসঙ্গত, হুমায়ুন কবির বলেছিলেন, 'হিন্দুরা এখানে ৩০ শতাংশ। এই ৩০ শতাংশকে আমরা ভাগীরথী নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারি'। এই মন্তব্যের পরেও হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি তৃণমূলনেত্রী। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মতো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই ভর্ৎসনা, মিথ্যাচার এবং এহেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য আপামর শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ভক্তরা ছাড়াও সকল সাধুসন্ত ও সাধারণ হিন্দুর জন্য অপমান স্বরূপ। এই দুই সন্ন্যাসী সঙ্ঘকে নিয়ে মিথ্যাচার ছাড়াও রাজনীতির আঙ্গিনায় অনাবশ্যকভাবে তিনি তাদের টেনে এনেছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন একটি অরাজনৈতিক সংগঠন, যার পরিধি আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত। এই ধর্মীয় সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গের, ভারতের তথা বিশ্বের এক অতি শ্রদ্ধার স্থল। সনাতন হিন্দু পরম্পরার এহেন সুমহান সংগঠনগুলি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মিথ্যা অপবাদ ও দোষারোপ শুধুমাত্র অপমানের নয়, অসম্মানের। তৃণমূল কংগ্রেস এর আগে মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীর অবতার আখ্যা দিয়েছে। এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির হাতে তাদের দলীয় পতাকা ধরিয়ে দেওয়া-সহ ঘৃণ্য অপকর্মের জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রীর দল। সর্বস্ব ত্যাগী সন্ন্যাসীদের এহেন কুৎসিত ও নিন্দনীয় ভাষায় আক্রমণে হিন্দুদের বিশ্বাস, সম্মান, আস্থা ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রে আঘাত হেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে হিন্দুদের 'আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার' আহ্বান জানানো হলো ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও শ্রীশ্রী প্রণব মঠের তরফে। গত ২০ মে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের বাণী উদ্ধৃত করে তাদের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'বাঙ্গালি হিন্দুর সামনে আজ একমাত্র পন্থা— বীরবিক্রমে যাবতীয় অন্যায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান এবং আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া'। এইদিন কার্তিক মহারাজের তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৪ দিনের মধ্যে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি জানিয়ে আইনি চিঠি পাঠানো হয়েছে। মহারাজ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য আমাকে খুব বেদনাহত করেছে। এটা ব্যক্তি হিসেবে আমার অপমান নয়, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দীর্ঘ দিনের সেবাব্রতী পরম্পরার অপমান। নিজের শ্রাদ্ধ করে সন্ন্যাস নিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী আর কী করবেন!' □

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত শারদাপীঠ

ভারতে ইসলামি আগ্রাসনে পঞ্চমবাহিনী সুফি-দরবেশদের ভূমিকা

প্রণব দত্ত মজুমদার

সুফি শব্দটি শুনলেই মনে হয় গান-বাজনার সঙ্গে আল্লার বাণী প্রচার করে বেড়ানো এক ধরনের ইসলামি সাধক, যেন অনেকটা আমাদের বাউল বা বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের মতো মানবপ্রেমের পূজারি। কিন্তু সত্যি কি তাই? ইসলামের প্রকৃত ইতিহাসের দিকে তাকালে কিন্তু অন্য চিত্র ধরা পড়বে।

ইসলাম প্রসারের প্রথম দিকে ইসলামের সৈনিকরা একের পর এক দেশ দখল করে মেরে-কেটে সবাইকে ইসলামে দীক্ষিত করছিল। শরিয়া কানুন এবং ইসলামি অনুশাসনের সুসংবদ্ধ রূপটি তখনো কায়াকল্প পায়নি। সেই সময়কালে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান শাসকরা যখন সাসান সাম্রাজ্য (পার্সিয়ান সাম্রাজ্য) এবং তুর্কি সাম্রাজ্য দখল করে সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ইসলামের আরবীয় কট্টর অনুশাসন সেখানে চালু করেছিল, তখন সেখানে কিছু ইসলামিক বিশেষজ্ঞের উদ্ভব হয়েছিল যারা ইসলামের মধ্যে একটি অন্যরকম সহজ ভাব আনতে চেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের চিন্তাভাবনায় সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটি মিলনের ভাব বা একাত্মতার ভাব আনার চেষ্টা করছিলেন— যেটা আনেকটা ভারতীয় অদ্বৈত দর্শনের মতো— ভক্ত আর ভগবান একই পরম সত্তার অংশ। এইরকম চিন্তাভাবনা তাঁরা ওই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। ইতিহাসে এটি মুতাজ্জালি মুভমেন্ট নামে পরিচিত। এঁদের পাশাপাশি আর একটি সম্প্রদায়— তাহকিকি প্রায় একই রকম চিন্তাভাবনা, যেমন মানুষের আত্মার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার মিলনের তত্ত্ব খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। এইভাবে ওই অঞ্চলে এইরকম একটি চিন্তাভাবনার জন্ম হয়েছিল যাকে সুফিবাদ বলা যেতে পারে। ইসলামের কট্টরপন্থী অনুসারীরা তখন এর তীব্র বিরোধ করতে আরম্ভ করেছিল এবং এই ধরনের চিন্তাভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা হয়েছিল।

ইসলাম অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা (আল্লা) এবং তাঁর সৃষ্টি (মানুষ) ভিন্ন সত্তা এবং তাদের মধ্যে কখনোই কোনো আত্মিক সম্পর্ক থাকতে পারে না। মানুষ সবসময়ই আল্লাকে ভয় পেয়ে চলবে এবং আল্লা ও তাঁর পয়গম্বরের দেখানো পথকে কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে। তার থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়া চলবে না; তা হলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। একাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কট্টরপন্থী সুফি আল-গাজালি, আব্বাশিদ খলিফাদের সবায়তায় কঠোর হস্তে সুফিদের এই সব মুক্ত চিন্তাভাবনার বিনাশ করেছিল। সুফিদের কট্টরপন্থী ইসলামের মূল ধারায় নিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে সুফিরাও কঠোরভাবে শরিয়া কায়দা কানুন মেনেই চলে।

ইসলামের মতে প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হলো ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অংশ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে

অমুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাহলেই তারা জান্নাতে যেতে পারবে। সুফিরাও এখন এইসব কথাই প্রচার করে থাকে। বিখ্যাত সুফি চিন্তাবিদ আল-গাজালি তাঁর অনুগামী মুসলমানদের উপদেশ দিত— 'বছরে অন্তত একবার জিহাদে অবশ্যই অংশ নিতে হবে। দুর্গে অবস্থানকারীদের মাঝে নারী-শিশুরা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে গুলতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অগ্নিসংযোগ করে তাদেরকে পুড়িয়ে কিংবা ডুবিয়ে মারা যেতে পারে। তাদের জমির ফসল নষ্ট করে ফেলা যেতে পারে। তাদের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। জিহাদিরা লুণ্ঠিত মালামাল ইচ্ছে অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারে। (জিহাদ— এম এ খান পৃষ্ঠা-১৪৮)। এর থেকেই পরিষ্কার যে, সুফিরা মোটেই ভোলাভালা সাধুসন্তদের মতো নয়। ছলচাতুরি, কৌশল প্রয়োগ করে, প্রয়োজনে জিহাদ করে ইসলামের সম্প্রসারণের কাজ করাই এঁদের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় এরাই পঞ্চম বাহিনীরূপে কাজ করেছে।

ইসলামি হামলাকারীদের পথ ধরে যে সব বিখ্যাত সুফি দরবেশ ভারতে আসে তাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি নাম হলো, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, বাবা ফরিদ, আমির খসরু, শাহ জালাল, শেখ আহমেদ শিরিন্দ্রি, শাহ আব্দুল রহিম ও তাঁর ছেলে শাহ ওয়ালিউল্লা, শামসুদ্দিন মহম্মদ ইরাকি, সৈয়দ আলি হামদানি এবং তার পুত্র আমির সাইদ মহম্মদ। এরা সবাই ছিল ইসলামের কট্টর অনুসারী এবং চরম অসহিষ্ণু প্রকৃতির। এরা গোঁড়া ইসলামিক উলেমাদের মতামতকেই উচ্চ মূল্য দিত, তাঁদের অনুগামীদের আইন ও সামাজিক আচার বিচারে উলেমাদের মতামতকেই মেনে চলার নির্দেশ দিত। অর্থাৎ কট্টর ইসলাম পন্থা ছাড়া অন্য কোনো মুক্ত চিন্তার বা দর্শনের ধারে কাছে এঁরা ছিল না। ভারতে আসা কয়েকজন সুফির কর্মকাণ্ড দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি (১১৪১-১২৩০) তার অনুগামীদের নিয়ে ভারতে এসেছিল বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য। সে রাজা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে মহম্মদ ঘোরির বিরুদ্ধে কপট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

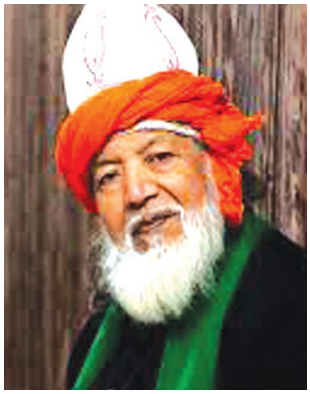
নিজামুদ্দিন আউলিয়া

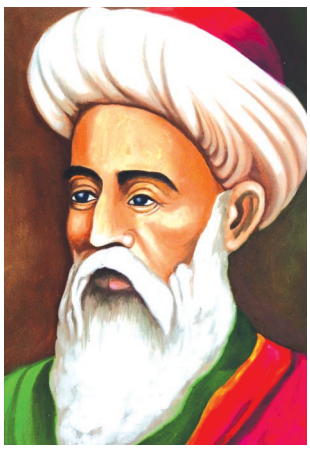
আমির খাসরু

আল গাজালি

খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি

আজমিরের সেই যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ অন্য হিন্দু রাজা জয়চন্দ্রের (জয়চাদ) বিশ্বাসঘাতকতার কারণে পরাজিত হয়েছিলেন। এর ফলে ভারতে সর্বপ্রথম তুর্কি শাসনের বিস্তার করে মহম্মদ ঘোরি। মইনুদ্দিন চিস্তি এই জিহাদে এতটাই উদ্দীপ্ত ছিল যে যুদ্ধজয়ের সমস্ত গৌরব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বলেছিল— 'আমরা পিথাউরাকে (পৃথ্বীরাজকে) জীবন্ত আটক করে ইসলামের বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছিলাম।' মইনুদ্দিন চিস্তি হিন্দুধর্ম ও তার চর্চাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। আজমিরে তার ডেরা স্থাপনা করার পর, তার প্ররোচনায় তার ভক্তরা প্রতিদিন একটি বিখ্যাত মন্দিরের সামনে একটি গোরু জবাই করতো, তারপর তার কাবাব বানিয়ে খাওয়া হতো (জিহাদ— এম এ খান পৃষ্ঠা-১৪৯)। হিন্দুদের প্রতি এত ঘৃণা যার ছিল সেই মইনুদ্দিন চিস্তির দরগা আজমির শরিফে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ হিন্দু চাদর চড়াতে যায়। ইতিহাস সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ হলে এবং নিজের ধর্মের প্রতি কতটা উদাসীন হলে, তবে এই কাজ করা যায়।

নিজামুদ্দিন আউলিয়া (১২৩৮-১৩২৫) বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জিহাদে বিশ্বাস করত শুধু নয়, সে জিহাদ করতেই তার অনুগামীদের নিয়ে ভারতে এসেছিল। সে মুলতানে নাসিরুদ্দিন কিবাচা পরিচালিত এক জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিল। নিজামুদ্দিন আউলিয়া সুলতান আলাউদ্দিনের জিহাদ অভিযান থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল থেকে বিপুল পরিমাণ উপহার গ্রহণ করেছিল (জিহাদ করার পর লুঠ করে যা পাওয়া যায় এমনকী নারী পর্যন্ত তাকেই গনিমতের মাল বলে) এবং সেগুলো তিনি তাঁর খানকায় গর্বের সঙ্গে প্রদর্শন করত। সে হিন্দুদের অভিসম্পাত করে বলত, তারা নরকের আগুনে পুড়বে। বিধর্মীদের সম্পর্কে বলতেন— 'বিধর্মীরা মৃত্যুকালে শাস্তি পাবে। সে মুহূর্তে তারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করবে, কিন্তু তখন তাদের সে বিশ্বাস আল্লার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।' সে বিধর্মীদের পাপী হিসেবে নিন্দা করে বলত— 'আল্লা বিশ্বসীদের জন্য স্বর্গ ও অবিশ্বাসীদের জন্য নরক সৃষ্টি করেছেন' (জিহাদ— এম এ খান

পৃষ্ঠা-১৪৮)। এখানে মনে রাখতে হবে আল্লা ও তাঁর পয়গম্বরকে যারা বিশ্বাস করে তারাই বিশ্বাসী বা মুসলমান, অন্যরা অবিশ্বাসী বা কাফের।

আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫) ছিলেন নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কৃতী শিষ্য। ভারতীয়দের কাছে তিনি উদার সুফি কবি ও গায়ক হিসেবে পরিচিত। তিনি ভারতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি কাওয়ালী গানের স্রষ্টা। এখনো তাঁর গান বিভিন্ন জলসায় বড়ো বড়ো শিল্পীরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশ করে থাকেন। তিনি প্রতিভাবান ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাই বলে তিনি হিন্দুদের মোটেই প্রেম বিতরণ করে যাননি। কট্টরপন্থীদের মতোই হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে চিতোর বিজয়ের পর খিজির খান কর্তৃক ৩০ হাজার হিন্দু বন্দিকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লসিত আমির খসরু লেখেন— 'আল্লাকে ধন্যবাদ যে তিনি বিধর্মী-ছেদনকারী তলোয়ার দ্বারা ইসলামের চৌহদ্দি থেকে সকল হিন্দু নেতাদের হত্যার আদেশ দেন— ভারতে অবিশ্বাসীদের কোনোই স্থান নেই' (জিহাদ— এম এ খান, পৃষ্ঠা ১৫০)। মালিক কাফুর যখন দক্ষিণ ভারতের চিদাম্বরম এ একটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে বহু হিন্দু ও পূজারিদের নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল, তখন আমির খসরু কাব্য করে লেখেন— 'ব্রাহ্মণ ও মূর্তি পূজকদের গর্দান থেকে মস্তক নাচতে নাচতে মাটিতে তাদের পায়ের উপর গড়িয়ে পড়লো ও রক্তের স্রোত বয়ে গেল।' ইসলামের বর্বর আক্রমণে হিন্দু নিধনযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে গোঁড়ামি পূর্ণ উল্লাসে তিনি লেখেন— 'সমগ্র দেশ আমাদের পবিত্র ধর্ম-যোদ্ধাদের তরবারি দ্বারা আগুনে ভস্মীভূত কণ্টকশূন্য জঙ্গলের মতো হয়ে গেছে। ইসলাম বিজয়ী হয়েছে, পৌত্তলিকতার পতন ঘটেছে। জিজিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির আইন মঞ্জুর করা না হলে, হিন্দুদের নামটি শিখর ও শাখা-সহ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত' (জিহাদ— এম এ খান, পৃষ্ঠা ১৫১)। সুফি কবি ও গায়ক আমির খসরু তাঁর কোনো লেখায় হিন্দুদের প্রতি সন্তসুলভ কোনো প্রেম প্রদর্শন করেননি, বরং কট্টর ইসলামপন্থীদের মতোই হিন্দুদের প্রতি তীব্র ঘৃণা বর্ষণ করেছেন; অথচ এখনো হিন্দুরা তাঁকে মাথায় তুলে নাচে।

সুফি দরবেশ শাহ জালালের হাত ধরেই পূর্ববঙ্গে ইলামের প্রসার হয়েছিল। বঙ্গপ্রদেশে ইসলামের প্রবেশ ঘটে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে। ওই সময় বক্তিয়ার খিলজি গৌড় দখল করে। ১৩০৩ সাল নাগাদ পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টের দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বাধীন রাজা ছিলেন গৌড়গোবিন্দ। রক্ষাকবজের মতো শ্রীহট্টকে ঘিরে রেখেছে সুরমা নদী। ইসলামের বাহিনী কিছুতেই শ্রীহট্টে প্রবেশ করতে পারছিল না। সুফি দরবেশ শাহ জালাল সেখানে ইসলামি দরবেশ হিসেবে প্রবেশ করতে পেরেছিল। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ধর্মভীরু হিন্দুরা সুফি দরবেশদের হিন্দু ধর্মগুরুদের মতোই শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে, আর তারই সুযোগ নিয়ে থাকে চতুর সুফি-দরবেশরা। শাহ জালালও তাই করেছিল। সে তার অনুগামীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলল, তারপর একদিন সুযোগ বুঝে ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত করে ইসলাম বাহিনীকে সুরমা নদী অতিক্রম করে শ্রীহট্টে ঢুকতে সাহায্য করে এবং অতর্কিতে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে প্রধান আমাত্য মনা রায়কে হত্যা করা হয়, রাজা সপরিবারে পালিয়ে যান। ইসলামি জিহাদিরা শ্রীহট্ট দখল করে নেয়, শহরের নাম দেওয়া হয় জালালাবাদ, সুফি শাহ জালালের নামে। ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম এখন— হজরত শাহ জালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট।

মুঘল দরবারেও সুফিদের খুব প্রভাব ছিল। জাহাঙ্গিরের শাসনকালে (১৬০৬ সালে) বিখ্যাত সুফি শেখ আহমেদ শিরিন্দ্রি বাদশাহকে কাফের ও মূর্তিপূজকদের প্রতি কঠোর হতে পরামর্শ দিয়েছিল। আহমেদ শিরিন্দ্রির পরমর্শেই জাহাঙ্গির শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনদেবকে দিল্লিতে গ্রেপ্তার করে আনতে বলে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তাঁকে হত্যা করা হয়। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের উপরও তার প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। ঔরঙ্গজেব, শেখ আহমেদ শিরিন্দ্রির ছেলে শেখ মাসুমের মুরীদ (শিষ্য) হয়ে গেছিলেন। শেখ মাসুমের ছেলে সইফুদ্দিন ঔরঙ্গজেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রেরণাতেই ঔরঙ্গজেব প্রায় ৫০০ মুসলমান স্কলার নিয়োগ করে রচনা করান ভারতে শরিয়া কানুনের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ 'ফতোয়া আলমগিরি'। এই গ্রন্থ রচনার অন্যতম কারিগর ছিল বিখ্যাত সুফি শাহ আব্দুল রহিম এবং তার ছেলে শাহ ওয়ালিউল্লা। মারাঠা বীররা যখন মুঘলদের পরাজিত করে ভারতকে ইসলামি শাসন মুক্ত করছিলেন, তখন এই শাহ ওয়ালিউল্লাই আফগানিস্তানের শাসক আহমেদ শাহ আব্দালিকে ভারতে ডেকে এনেছিল মারাঠাদের শায়েস্তা করার জন্য।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার পবিত্রস্থান ছিল কাশ্মীর, ঋষি কশ্যপের সাধনাস্থল। এখানে ছিল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান শারদা পীঠ। দেবী সরস্বতীর বিশাল মন্দির ছিল কাশ্মীরের নিলম উপত্যকায়। এখন এটি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে এবং ইসলামি আগ্রাসনে তা এখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়ে রয়েছে। আদি শঙ্করাচার্য কাশ্মীরে সাধনার জন্য এসেছিলেন। বৌদ্ধ মতের প্রসার হয়েছিল এখানে। এহেন হিন্দু-বৌদ্ধের পবিত্র ভূমিকে হিন্দুশূন্য করার ব্যাপারে কাশ্মীরে ইসলামি শাসকদের সঙ্গে সঙ্গে সুফি দরবেশদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আমীর শামসুদ্দিন মহম্মদ ইরাকি, সইয়াদ আলি হামদানি ও তাঁর পুত্র আমীর সইয়াদ মহম্মদ প্রভৃতি সুফিরা মুসলমান শাসকদের প্ররোচিত করে ব্যাপক হারে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মস্থান ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধদের নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। বিভিন্ন মুসলমান শাসকদের আমলে ধর্ম ও মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য দলে দলে হিন্দু ও বৌদ্ধ কাশ্মীর ত্যাগ করে পলায়ন করেছেন।

ইসলামের সুফিদের এই ধরনের বর্বর আচরণ সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নয়। তাই দেখা যায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভক্ত, এমনকী হিন্দুত্ববাদী নেতা- মন্ত্রীরাও এই সুফিদের দরগায় চাদর চড়ান এবং গদ গদ হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। বিখ্যাত চিন্তাবিদ সীতারাম গোয়েল বলেছেন— অন্য ধর্মের মানুষের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই ইসলামের প্রসার ও শক্তির উৎস।

□

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর দীক্ষিত সৈনিক বসন্ত কুমার বিশ্বাস

তরুণ বিশ্বাস

ভারতবর্ষ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশ। পরাধীন ভারতে এই বিশাল দেশকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করতে কত যে বাঙ্গালি বিপ্লবী আত্মাহুতির পথ বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের কোনো ইয়ত্তা নেই। সশস্ত্র সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতায় বাঙ্গালিদের অবদান সবচেয়ে বেশি হলেও বাঙ্গালি বিপ্লবীরা আজও অবহেলিত। সেই অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম নদীয়ার বীর সন্তান বসন্ত বিশ্বাস আজও বিস্মৃত ও উপেক্ষিত।

সমগ্র বঙ্গদেশের নিপীড়িত মানুষের জন্য নদীয়ার মাটিতে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্বনাথ সর্দার, মেঘাই সর্দার, পোড়াগাছার দিগম্বর বিশ্বাস ও চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস প্রমুখ বিপ্লবী। তাঁদের সেদিনের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন নদীয়ার হাজার হাজার বীর কৃষক। বিপ্লবী দিগম্বর বিশ্বাস নিজের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে সেই টাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। এমনকী গরিব চাষিদের নেওয়া দাদনের ১৭০০০ টাকা দেনা মিটিয়ে দিয়ে নিজে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এই নীল বিদ্রোহের অন্যতম মহানায়ক বিপ্লবী বীর দিগম্বর বিশ্বাসের বড়োভাই সর্বানন্দের পৌত্র ছিলেন বসন্ত কুমার বিশ্বাস এবং ছোটো ভাই রামগোপালের পৌত্র ছিলেন বিপ্লবী মন্মথনাথ বিশ্বাস।

বসন্ত কুমার বিশ্বাসের জন্ম ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের অদূরে পোড়াগাছা গ্রামে এক শিক্ষিত বনেদি মাহিষ্য পরিবারে। পিতা মতিলাল বিশ্বাস ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী, মাতা কুঞ্জবালা দেবী। চার ভাই-বোনের মধ্যে বসন্ত ছিলেন তৃতীয়। বসন্ত বিশ্বাস তাঁর জ্ঞাতিভাই মন্মথনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ শেষ করে নিকটবর্তী মাধবপুর গ্রামে প্রখ্যাত সমাজসেবী জমিদার, ইঞ্জিনিয়ার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী গগনচন্দ্র বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত 'মাধবপুর শ্রীমন্ত মিডিল ইংলিশ স্কুল'-এ ভর্তি হন। সেখানকার পড়া শেষ করে ১৯০৬ সালে বসন্ত ও মন্মথনাথ নদীয়ার 'মুড়াগাছা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়'-এ শ্রীরূপলাল খাঁর তত্ত্বাবধানে ভর্তি হন। তাঁরা থাকতেন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ও যুগান্তর দলের সহকর্মী। তাঁর অনুপ্রেরণায় পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি কামনায় বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাঁদের পরিচয় করান যুগান্তর গোষ্ঠীর কর্মী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাই পাকাপাকি ভাবে দেশমাতৃকার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং যুগান্তর দলে যোগ দেন। কলকাতায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত স্বদেশি পণ্যের 'শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড'-তে বসন্ত ও মন্মথনাথ কিছুদিন কাজ করেন। তাঁর থাকতেন অমরেন্দ্রনাথের উত্তর পাড়ার বাড়িতে। এই দোকানটি ছিল বিপ্লবীদের একটি শক্ত গোপন ঘাঁটি। বেশ কিছুদিন এখানে কাজ করার পর অমরেন্দ্রনাথ দুই ভাইকে চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী মতিলাল রায়ের কাছে পাঠান। মতিলাল রায় বসন্ত ও মন্মথনাথকে সহকারীরূপে নিজের বাড়িতে কিছুদিন রেখে তাঁদের বোমা তৈরি, বোমা ছোঁড়া ও বন্দুক চালানোর শিক্ষা দেন। রাসবিহারী বসু মতিলালের বাড়িতে সেই সময় আসা-যাওয়া করতেন। এই বাড়িতে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে বসন্ত ও মন্মথনাথের পরিচয় হয়।

রাসবিহারী বসু ১৯০৮ সালে কলকাতার মুরারীপুকুর বোমা মামলায় জড়িত থাকায় দেরাদুনে আত্মগোপন করেছিলেন। সেখানে বনবিভাগের এক গবেষণা কেন্দ্রে হেড ক্লার্কের কাজ নিয়ে 'টেগোর ভিলা'-য় থাকছিলেন। এই সময় তিনি পঞ্জাব-সহ সমগ্র উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংস্থাগুলির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তিনি লক্ষ্য করেন দেরাদুনের প্রবাসী বাঙ্গালি যুবকদের বিপ্লবীদলে আনতে হলে একজন বিশ্বস্ত বাঙ্গালি বিপ্লবী যুবককে একান্ত প্রয়োজন। রাসবিহারী বসু বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁদের মধ্যে বসন্তকে বেশি চটপটে ও সপ্রতিভ দেখে তাঁকেই বৈপ্লবিক কাজের জন্য অমরেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে দেরাদুনে নিয়ে যান ১৯১১ সালের শেষের দিকে। বসন্ত বিশ্বাস বিশুদাস ছদ্মনামে রাসবিহারী বসুর কাজের লোক হিসেবে সেখানে থাকতে শুরু করেন। আর 'টেগোর ভিলা'র আমবাগানে

রাসবিহারী বসুর তত্ত্বাবধানে বোমা ছোড়ার অনুশীলন শুরু করেন। একটানা তিনমাস অনুশীলন করার পর বসন্তকে ১৯১২ সালের মাঝামাঝি তিনি লাহোরে নিয়ে এসে বিপ্লবী বলরাজের সহযোগিতায় সেখানকার 'পপুলার ফার্মেসিতে কাজে লাগিয়ে দেন, যাতে এই নবাগত বাঙ্গালিকে কেউ সন্দেহ না করে। বসন্ত থাকতেন ঝিলম নদীর তীরে বিপ্লবী বালমুকুন্দের খাপরার ঘরে।

বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের তখন চরম আর্থিক দুরবস্থা। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন। এই খবর বসন্ত জানতে পেরে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'বিপ্লবীরা কি ভাড়াটে সৈনিক যে বিপ্লবী কাজ করার জন্য তাঁদের পয়সা নিতে হবে? আমি পয়সার জন্য এসব করি না। রাসবিহারী উত্তর ভারতের স্থানীয় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। সেখানে একটি গুপ্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। সেখানে একটি গুপ্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়, এই গুপ্ত কমিটিতে স্থান পান আমীর চাঁদ, দীননাথ তলোয়ার, বালমুকুন্দ, বলরাজ ও বসন্ত বিশ্বাস। বসন্ত হয়ে ওঠেন রাসবিহারী বসুর ডান হাত।

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশরাজ পঞ্চম জর্জ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক দরবারে বঙ্গভঙ্গ আইন বাতিল বলে ঘোষণা করেন, সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে। ঠিক হয় আগামী বছর ভারতের সমস্ত বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে বড়লাট হার্ডিঞ্জ নতুন রাজধানী উদ্বোধন করবেন।

এই সংবাদ পেয়ে রাসবিহারী বসু ১৯১২ সালের ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যার পর লাহোরে আগরওয়ালা আশ্রমে গুপ্ত সমিতির একটি মিটিং করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বসন্ত বিশ্বাস, অবোধবিহারী, দীননাথ তলোয়ার ও লাহোরের বালমুকুন্দ। এই বৈঠকেই হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় কুশলী বোমা বিশেষজ্ঞ এবং উত্তর ভারতের কনিষ্ঠ বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে।

পরিকল্পনা-মতো ১৯১২ সালের ২১ ডিসেম্বর রাসবিহারী বসু বসন্ত বিশ্বাস ও অবোধবিহারীকে নিয়ে দিল্লি পৌঁছে তিনি দু'জনকে পুরো ছকটি বুঝিয়ে দেন। কথা ছিল প্রথমে বোমা ছুড়বে বসন্ত বিশ্বাস। যে কোনো কারণে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় বোমাটি ছুঁড়বে অবোধবিহারী।

ঘোষণা মতো ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক হাতির পিঠে মুঘল বাদশার ব্যবহৃত রুপোর হাওদায় চেপে স্থানীয় রাজন্যবর্গকে নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে দিল্লি স্টেশন থেকে চাঁদনিচকের পথ ধরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে দিয়ে আম-দরবারে যাচ্ছিলেন। ব্যাংকের বিপরীত দিকে প্রীতমদাসজীর অট্টালিকার দোতলার বারান্দায় মেয়েরা শোভাযাত্রা দেখার জন্য ভিড় করেছিলেন। বসন্ত মহিলার বেশে লীলাবতী নাম নিয়ে মেয়েদের ভিড়ে মিশে যান এবং ব্যাংকের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা রাসবিহারী বসুর সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় রইলেন। রাসবিহারী বসুর আচমকা মনে হয়, বসন্ত দোতলা থেকে বোমা ছুঁড়লে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে, কারণ যে ভূমি থেকে বোমা ছোঁড়া অভ্যাস করেছে। বসন্তকে ইশারায় নেমে আসতে বলেন। আর বলেন প্রীতমদাসজীর বাড়ির বাথরুমে পোশাক বদলে পুরুষের বেশে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওখান থেকেই বোমা ছুঁড়তে। শোভাযাত্রাটি কাছে এলে রাসবিহারী বসুর ইশারা পাওয়া মাত্র বসন্ত হাতির পিঠে বসে থাকা হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লে তা গিয়ে পড়ে হাতির পিঠে থাকা হাওদার ঠিক পিছনের দিকে। বিকট বিস্ফোরণ আর চোখ বাঁধানো ঝলকানির মধ্যে শুধু একটা আওয়াজ ভেসে উঠল— শাবাশ। মারডালা। বোমার আঘাতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ গুরুতরভাবে আহত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হাওদার মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর পিঠে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছত্রধারীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিশৃঙ্খল জনতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বসন্ত, অবোধবিহারী ও রাসবিহারী বসু পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর তাঁরা নিজেদের কর্মস্থলে ফিরে যান। ব্রিটিশ সরকার শত চেষ্টা করেও অপরাধীকে ধরতে না পেরে অপরাধীকে ধরে দেওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

ব্রিটিশ সরকারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য দেরাদুনে বিশাল জনসভায় রাসবিহারী বসু সভাপতি হিসেবে দাঁড়িয়ে হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। এইসব করে রাসবিহারী বসু ইংরেজদের চোখে দেবদূত হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পর রাসবিহারী বসুর কাছে খবর আসে অত্যাচারী সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডন পূর্ববঙ্গের সিলেটের 'দয়ানন্দ আশ্রমে' গুলি চালিয়ে ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র দত্তকে হত্যা করেছে এবং আশ্রমবাসীদের পশুর মতো নির্যাতন করে আশ্রমটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেখানকার বিপ্লবীরা গর্ডনকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সরকার আতঙ্কিত হয়ে তাঁকে লাহোরে বদলি করে। এবার রাসবিহারী গর্ডনকে হত্যার দায়িত্ব দিলেন বসন্ত বিশ্বাস ও অবোধবিহারীর ওপর।

লাহোরে লরেন্স গার্ডেন মন্টোগোমারি হল নামে একটি নৈশ ক্লাব ছিল, সেখানে গর্ডন নিয়মিত যাতায়াত করত। ১৯১৩ সালে ১৭ সন্ধ্যাবেলায় পরিকল্পনা অনুযায়ী বসন্ত ও অবোধবিহারী 'লরেন্স গার্ডেনে' যান, কিন্তু নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। তখন বসন্ত গর্ডনের 'মন্টগোমারি হলে' যাতায়াতের পথ জিমখানা লাইব্রেরি রোডে একটি বোমা রেখে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গর্ডন ওই পথে আসার আগেই রামপদ রথ নামে এক চাপরাশির সাইকেলের চাকায় ধাক্কা লেগে বোমাটি

ফেটে যায় এবং তার মৃত্যু ঘটে।

বসন্ত বিশ্বাস দিল্লি ও লাহোরে যে দুটি বোমা ব্যবহার করেছিলেন, সে দুটি বোমা তৈরি করেছিলেন চন্দননগরের বিপ্লবী মণীন্দ্রনাথ নায়ক এবং সেগুলি চেক করে দেন রিপন কলেজের (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্ত। বোমা দুটিকে দিল্লিতে নিয়ে যান চন্দননগরের জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ। দিল্লি ও লাহোরের ঘটনার কিনারা করতে স্কটল্যান্ড থেকে দক্ষ গোয়েন্দা দল এসে পরীক্ষা করে বলে, 'দিল্লি ও লাহোরের বিস্ফোরিত বোমার মালমশলা এক। সম্ভবত বঙ্গপ্রদেশে তৈরি বোমাটি।' ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বঙ্গপ্রদেশে অনুন্ধানের তৎপরতা বাড়ে। অবশেষে ১ বছর পর ১৯১৪ সালে রাজাবাজারে বিপ্লবী অমৃতলাল হাজরার মেসে হানা দিয়ে পুলিশ কিছু বিস্ফোরক আর সাংকেতিক ভাষায় লেখা কিছু চিঠিপত্র পায়। ডেনহাম সাংকেতিক চিহ্নের মর্মোদ্ধার করে কিছু বিপ্লবীদের নাম ঠিকানা জানতে পারেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ তারিখে দীননাথ তলোয়ার গ্রেপ্তার হন। এদিকে দীননাথ প্রাণ বাঁচাতে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে কয়েকজন বিপ্লবীর নাম বলে দেন। পরে তাঁরই স্বীকারোক্তিতে বলরাজ ভাল্লা, বালমুকুন্দ, আমীরচাঁদ ও অবোধবিহারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বসন্ত ও রাসবিহারী আত্মগোপন করে থাকেন।

ইতিমধ্যে বসন্তের বাবার মৃত্যু হয়। ১৯১৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বসন্ত ঘাটশ্রাদ্ধের দিন কেনাকাটার উদ্দেশে কৃষ্ণনগরে তাঁর অবসর প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ছোটো কাকা প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে ওঠেন, তখনই প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাসের এক আত্মীয় প্রমথনাথ বিশ্বাস সরকারি চাকরিতে পদোন্নতির লোভে বসন্ত বিশ্বাসের খবর থানায় জানায়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ বাহিনী নিয়ে দেরাদুনের ডিএসপি সুনীল ঘোষ নিরস্ত্র বসন্তকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাঁকে ধরতে আসছে, এই খবর দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ মন্মথনাথকে

বসন্তের স্মৃতি রক্ষার্থে রাসবিহারী বসু নিজের হাতে জাপানের টোকিয়ো শহরে মাদাম-তেৎসু-কোং-হিগোচির বাগানে 'ওক' কাঠের স্মৃতিফলক প্রোথিত করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাসবিহারী বসু ভুলতে পারেননি তাঁর মন্ত্রশিষ্য প্রিয় বসন্ত বিশ্বাসকে।

বসন্তের কাছে শেষ মুহূর্তে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বসন্ত পালানোর সুযোগ পায়নি।

এরপর বসন্ত বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় এনে জেরা করার পর পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ তাঁকে নিয়ে লাহোর চলে যায়। প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় তাঁর বইতে লিখেছেন—'সেই নির্ভীক বাঙ্গালি তরুণের মুখে পুলিশের শত অত্যাচারে একটি কথাও উচ্চারিত হয় নাই। তাহা যদি হইত অমরেন্দ্রনাথ ও আমি যুগপৎ বন্দি হইতাম।'

ইংরেজ পুলিশ বসন্ত-সহ ধৃত অন্য দশজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহ, হত্যা ও বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার অভিযোগ দিল্লি ও লাহোরের ঘটনা একত্রিত করে 'দিল্লি-লাহোর ষড়যন্ত্র' নামে ঐতিহাসিক মামলা শুরু করে ১৬ মার্চ ১৯১৪। এই মামলায় দীননাথ তলোয়ার ছিল প্রধান রাজসাক্ষী আর এক রাজসাক্ষী হলো বিপ্লবী নেতা আমিরচাঁদের এক আত্মীয় সুলতানচাঁদ।

২১ মে দিল্লির অ্যাডিশনাল সেশন জজ্ মি. হ্যারিসনের আদালতে ওই ঐতিহাসিক মামলার বিচারে প্রহসন শুরু হয়। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি প্রথমে ব্যারিস্টার এস.কে. সেন এবং ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশকে এই মামলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। মামলায় সকলপ্রকার তদারকি করেন বিপ্লবী মন্মথনাথ বিশ্বাস।

৫ অক্টোবর দিল্লি কোর্ট আমিরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসির হুকুম এবং নাবালক বিবেচনায় বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। ইংরেজ সরকার বসন্তকে ফাঁসি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লাহোর হাইকোর্টে আপিল করে। এই অপিলে বসন্তের বয়স ২/৩ বছর কারচুপি করে বাড়িয়ে ২৩ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল সাবালক বসন্ত বিশ্বাস তাঁর ওইসব কাজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। একতরফা বিচারে ১৯১৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বসন্ত বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। এরপর বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা হলে আপিল ১৯১৫ সালে এপ্রিল মাসে অগ্রাহ্য হয়।

৮ মে ১৯১৫। দিল্লির সেন্ট্রাল জেলে আমিরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসি হয়। বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয় পাঞ্জাবের আম্বালা জেলে ১০ মে (মতান্তরে ১১ মে) মাত্র ২০ বছর বয়সে। শত অনুরোধেও ব্রিটিশ সরকার সৎকারের জন্য বসন্তের মরদেহ প্রিয়জনেদের হাতে তুলে দেয়নি। প্রিয়শিষ্য বসন্তের মৃত্যুতে রাসবিহারী বসু মানসিকভাবে ভীষণ ভেঙে পড়েন। বসন্তের ফাঁসির দুদিন পরে ১৯১৫ সালের ১২ মে রাসবিহারী বসু পিএন ঠাকুরের ছদ্মবেশে চিরতরে ভারত ছেড়ে 'সানুকিমারু' জাহাজে জাপানে রওনা হন দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। বসন্তের স্মৃতি রক্ষার্থে রাসবিহারী বসু নিজের হাতে জাপানের টোকিয়ো শহরে মাদাম-তেৎসু-কোং-হিগোচির বাগানে 'ওক' কাঠের স্মৃতিফলক প্রোথিত করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাসবিহারী বসু ভুলতে পারেননি তাঁর মন্ত্রশিষ্য প্রিয় বসন্ত বিশ্বাসকে।

(লেখক বসন্ত বিশ্বাসের পৌত্র)

শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনে আক্রান্ত সন্ন্যাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৮ মে একটি জনসভায় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের একাংশের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে প্ররোচনামূলক বক্তব্য পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিলিগুড়িতে জমি মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা। ওই দিন মধ্যরাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সন্ন্যাসীদের উপর হামলা চালাল একদল গুন্ডা। পাঁচ জন সন্ন্যাসী ও নিরাপত্তারক্ষীদের অপহরণ করে পরে বেশি রাতে নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন লাগোয়া এলাকা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় নিন্দায় সরব বিভিন্ন মহল। কমিশনারেট এলাকায় সন্ন্যাসীদের উপর হামলায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষজনও।

শিলিগুড়ির সেবক রোডের চার মাইলে প্রায় দু'একর জমি-সহ একটি বহুতল (সেবক হাউস) রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেছিলেন এক ব্যক্তি। পরবর্তীকালে সেই জমি নিয়ে মামলা হলেও সেই সম্পত্তি এখনও মিশনের হাতেই আছে। সেখানে স্কুল তৈরির পরিকল্পনা করেছে মিশন। সেই সেবক হাউসে থাকতেন মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী। গত ১৮ মে রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ১০-১২ জন দুষ্কৃতী জোর করে সেখানে ঢুকে তাঁদের শারীরিক নিগ্রহ করে বাইরে বের করে দেয় বলে অভিযোগ। কয়েক কোটি টাকা দামের ওই জমি দখলের জন্যই হামলা চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেবক রোডের ওই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দজী মহারাজ জানিয়েছেন— 'আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে দুষ্কৃতীরা নিরাপত্তাকর্মী ও সন্ন্যাসীদের মারধর করে মোবাইল কেড়ে নেয়। সেখানকার সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট করে দেওয়া হয়। প্রত্যেককে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। সন্ন্যাসীদের তুলে নিয়ে একেকজনকে রাতের অন্ধকারে একেক জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। মুখ খুললে খুন করে ফেলার হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। আমরা আতঙ্কিত। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। যথাযথ পদক্ষেপ হোক সেটাই চাই'। সূত্রের খবর, ওই জমি বিক্রির জন্য বেলুড় মঠে মিশনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছেও বেশ কয়েকবার ফোন করেছিল দুষ্কৃতীরা। তাতে লাভ না হওয়ায় হামলা করা হয়েছে বলেই অনুমান মিশনের সন্ন্যাসীদের। এই ঘটনার পর এখনও অধরা হামলাকারীরা। উল্টে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের বিরুদ্ধেই দায়ের হয়েছে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা। গত ২১ মে রাতে মেচেদায় ইসকনের মন্দির ও কার্যালয়ে হানা দেয় পুলিশ। কে কত দান দিচ্ছে তার হিসাব নিতে এই অতি-তৎপরতা দেখায় পুলিশ। যে ভাষায় সাধুসমাজ ও ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাতে সাধুসন্তদের উপর আক্রমণ আরও বাড়বে— এই আশঙ্কা প্রকাশ করে গত ২২ মে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে পরিষদ।

জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৭ ও ১৮ মে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনায় সরব হলো বঙ্গ বিজেপি। তাদের তরফে ট্যুইট করে এই ঘটনার জন্য রাজ্যের শাসক দলের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতিকে দায়ী করা হয়েছে। বিজেপির তরফে ঘটনার একাধিক ছবি পোস্ট করে লেখা হয়েছে— 'পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে হিন্দু মন্দিরে মর্মান্তিক ও বর্বরোচিত হামলা হয়েছে। মা দুর্গার মন্দির ও গ্রহরাজের মন্দির-সহ মোট তিনটি মন্দিরে দুষ্কৃতীরা হামলা করেছে। এই হিংসাত্মক কাজ তৃণমূলের নিরলস তুষ্টিকরণের রাজনীতির প্রত্যক্ষ পরিণতি, যা হিন্দু সম্প্রদায়কে বিপন্ন করেছে, আগামীদিনেও করবে'। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা ন্যায়সঙ্গতভাবে এই নির্মম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

সংবাদসূত্রে খবর, এই মন্দিরে হামলায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গত ১৮ মে সকাল থেকেই উত্তাল ছিল ধূপগুড়ি। দফায় দফায় পথ অবরোধ হয়েছে ধূপগুড়িতে। বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনকারীদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে গেলে প্রবল জনরোষের সম্মুখীন হয় পুলিশ। পথ অবরোধকারীরা রেল লাইনে বসে পড়েও অবরোধ করে। ফলে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। আন্দোলন দমনে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিলে সংঘর্ষ বাধে আন্দোলনকারী ও পুলিশের মধ্যে। ঘটনায় ৩ পুলিশকর্মী আহত হন। এলাকায় জারি হয় ১৪৪ ধারা। মোরঙ্গা এলাকায় জেলা পুলিশ সুপার খাণ্ডবাহালে উমেশ গণপত আন্দোলনকারী ও স্থানীয় মন্দির কমিটির সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁকে ঘিরেও চলে বিক্ষোভ। এই ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে বলে দাবি জানায় আন্দোলনকারীরা। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন যে এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের দাবি, মন্দিরে দুষ্কৃতী হামলায় দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আন্দোলন চলবে। খলাইগ্রাম স্টেশনে দুপুর ১টা থেকে ৩টে ১৫ মিনিট পর্যন্ত রেল অবরোধ করে আন্দোলনকারীরা। রেল রোকোর ফলে দিল্লিগামী সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস, আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদহগামী তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস ও একটি মালগাড়ী খলাইগ্রাম স্টেশনে আটকে পড়ে। পরে অবরোধ উঠলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।